বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এম. এ.

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশন
১৯৪৮

দাম ঃ দুই টাকা

৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
কর্তৃক প্রকাশিত ঃ ৫নং শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে বোধি প্রেসে
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

আড়িয়মদা, আশাদি ও শান্তাদিকে—

যাঁদের কাছে নূতন জীবনের
প্রথম আলোক-স্পর্শ পেয়েছি—

অনিল
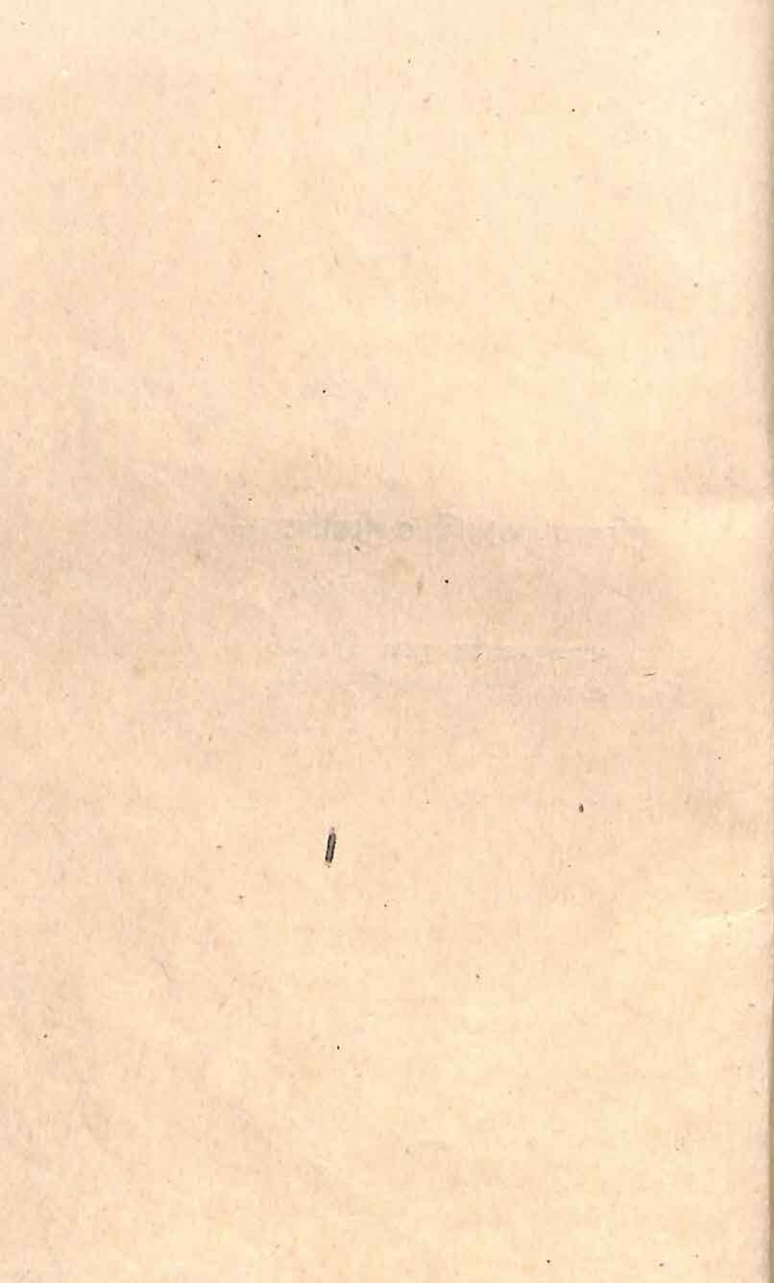
ভূমিকা

'বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। আমার বক্তব্য আরো অনেক আগেই জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা হ'য়ে ওঠেনি। প্রথম দিককার কয়েকটি প্রবন্ধ অনেক আগের রচনা—স্বাধীনতা লাভেরও প্রায় বছর খানেক আগে ওগুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। তাতে আমার বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ বিদেশী সরকার। আশা করেছিলাম, স্বাধীনতা লাভের পর পট-পরিবর্ত্তন ঘটবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন কর্মস্রোতের জোয়ার আসবে, আমার মন্তব্যগুলি নিষ্প্রয়োজন হ'য়ে উঠবে। স্বাধীনতা এসেছে, আরো বড় কথা এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছিল যে রাজনৈতিক দল আজ সেই কংগ্রেসের হাতেই দেশের শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে। তবু আমাদের দুর্ভাগ্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সুতরাং, প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোনরকম কাটছাঁট না করেই সেগুলি পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেক-গুলিই ইতিপূর্ব্বে 'মাতৃভূমি' ও 'সংগঠনে' প্রকাশিত হয়েছে। শেষের তিনটি প্রবন্ধ নূতন ক'রে লেখা। পত্রিকা দু'টির সম্পাদকদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি, তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাড়াগাঁয়ে থাকি আর তার মধ্যে কর্ম্মস্থানে শনি—উল্কার মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রবন্ধগুলি যখন আরম্ভ করি তখন ছিলাম বলরামপুরে, তারপর ২৪পরগণা ঘুরে বাঁকুড়ায় এসে ঠেকেছি।

এখানকার নোঙরও যে কবে তুলব তার ঠিক নেই। ফলে দু'টি ক্ষতি হয়েছে। যতটা যত্ন দিয়ে ছাপাখানার ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত ততখানি যত্ন ও সময় দিতে পারিনি; কাজেই, কয়েকটি গুরুতর ছাপার ভুল এখানে সেখানে র'য়ে গেছে। সহোদরপ্রতিম শ্রীপ্রহ্লাদ-কুমার প্রামাণিক ছাপাখানা সংক্রান্ত সমস্ত ঝঞ্ঝাটই পুইয়েছেন। তাঁকে মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ঋণ শুধবার অপচেষ্টা করব না। দ্বিতীয়তঃ কোথাও দীর্ঘকাল স্থির হ'য়ে থাকতে না পারায় কোন পরীক্ষার ফল পুরোপুরি দেখার সুযোগ ঘটেনি। এ ক্ষতি অপূরণীয়। পাঠকবর্গের কাছে এজন্য ক্ষমা চেয়ে লাভ নেই। তবে বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়ে সে ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

বইখানি প্রধানতঃ যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে লিখা। বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকের সামনে যে সব সমস্যা আসে, বিশেষভাবে বইখানিতে তারই আলোচনা করা হ'য়েছে। আজকাল বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষানীতি বলে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কথা ভাবছেন। বইখানিতে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য্য-সূচী বজায় রেখেও কি করে রূপান্তর সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আশা করি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ থেকে খানিকটা উপকৃত হবেন।

তাছাড়া বইখানি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল জনসাধারণেরও কাজে লাগবে বলে আশা করি। আজকাল 'বুনিয়াদী শিক্ষা' কথাটা আমাদের কাছে পরিচিত হ'য়ে উঠেছে কিন্তু বস্তুটা আজও আমাদের কাছে

সম্পূর্ণ অপরিচিত। Basic Educationটা Basic English-এর কাছাকাছি কিছু কি-না, এমনিতর প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্যগণ্য কোন অধ্যাপকের কাছ থেকেও শুনেছি। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য-ক্রমটিও পড়ে দেখেননি, কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ কোনদিন স্বচক্ষে দেখেননি অথচ তর্কের আসরে বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে প্রবল মতামত প্রকাশ করছেন, এমন লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে নগণ্য নয়। পুরাতনের মোহে আমরা এতদিন নূতনকে অবজ্ঞা করেছি; এই শিক্ষার প্রয়োগ আমাদের আশে পাশেই অনেকদিন ধরে চল্লেও আমরা এর খোঁজ নিইনি এতদিন। তাই আজ যখন সরকারী শিক্ষা-নীতি হিসাবে এই অজানা বস্তু আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে চলেছে তখন আর আমাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগের অন্ত থাকচে না। কিছুমাত্র প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে অনেক বন্ধু সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা একান্তই গেঁয়ো লোকের শিক্ষা; লেখা-পড়া শেখবার ব্যবস্থা এতে নেই, আছে শুধু গ্রাম্য কারিগর গড়বার ব্যবস্থা। শেষ তিনটি প্রবন্ধে এঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, এ শুধু রেখাচিত্র—বিস্তৃতভাবে এর উত্তর দেবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হয় নি।

কংগ্রেসী সরকারের আওতায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যে প্রচেষ্টা চলছে তাতেও জনসাধারণের বিভ্রান্ত হবার কারণ রয়েছে। আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আসেনি, এসেছে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। তাই যে যন্ত্রটা ইংরেজ আমলে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করত, দেশের ব্যবস্থা করবার জন্য দায়ী ছিল, সে যন্ত্রটার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজ কাজ চলবে, এমন আশা আমরা করতে পারি না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের এই অক্ষমতার প্রভাব খুব শুভ হয়নি। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা মূলতঃ এক বিপ্লবী

পরিকল্পনা। এর মধ্য দিয়ে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের জন্য উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে যাঁরা শিক্ষার কর্ণধার ছিলেন, তাঁদের পক্ষে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মস্থ করা, শোষণহীন, বিকেন্দ্রীত, স্বাবলম্বী সমাজ গঠনের উপযোগী শিক্ষাকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া সহজ নয়। তাই আজ 'বুনিয়াদী শিক্ষা' নামের আড়ালে যে শিক্ষার কথা তাঁরা ভাবছেন, তাকে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' বলা চলবে না বলে আশঙ্কা করার কারণ আছে। আমাদের ধারণা, বুনিয়াদী শিক্ষার দোষগুণ বোঝার জন্য, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রটিকে আবিষ্কার করার জন্য যতটুকু পরিশ্রম স্বীকার করা আবশ্যক, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকর্ম্মীদের সঙ্গে যতটুকু যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার তা করা হয়নি। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে আজ যে জিনিষকে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' বলে পরিবেশন করার পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে, তার দোষগুণ যাই হোক, গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে এর রূপ ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'বুনিয়াদী শিক্ষা' নামটা কারো রেজিষ্ট্রী করা নয় সত্যি, তাই তার যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকারও সকলেরই আছে। কিন্তু একটা প্রচলিত নামের অন্তরালে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ চালালে আইনের দরবারে না হোক্ ধর্ম্মের দুয়ারে দোষী হতে হয়। গান্ধীজী যে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে যার পরীক্ষা চলছিল, তা এক সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব কি-না তা সরকার বিচার করবেন; আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, সরকারী প্রচেষ্টার ফলাফল দেখে আমরা যেন গান্ধীজীর পরিকল্পনার ঔৎকর্ষের বিচার না করি। গান্ধীজী 'বুনিয়াদী শিক্ষা' বলতে যা বুঝতে চেয়েছিলেন, তারই প্রয়োগ নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করার চেষ্টা

করেছি। বলা বাহুল্য, এ সরকারী ভাষ্য নয়, নেহাৎই আমার নিজস্ব মতামত।

আশা ছিল, 'বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য একটি খণ্ডেই শেষ করতে পারব ; কিন্তু নূতন নূতন প্রশ্ন আসছে, নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাজে হাত দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, বক্তব্য ক্রমশঃ দীর্ঘ হ'য়ে উঠছে। যথাসাধ্য বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যা সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করার চেষ্টা করব, ফলে বক্তব্য কত দীর্ঘ হবে তা ভগবানই জানেন। ইতি—

গান্ধী জয়ন্তী ১৯৪৮ ইং
মধুবন বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্র
পোঃ ছাতনা, বাঁকুড়া

বিনীত
অনিলমোহন গুপ্ত

বিষয়সূচী

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

গোড়ার কথা

বুনিয়াদী শিক্ষায় আক্ষরিক জ্ঞানটা মুখ্য নয়। সংবাদের বাহুল্য দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞানের পরিমাপ হয় না, হয় জীবনের পূর্ণতা দিয়ে। সুতরাং, জীবন যেখানে রোগে পঙ্গু, সঙ্কীর্ণতায় ক্লিষ্ট, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জড়তায় কলঙ্কলিপ্ত, সৃজনের অক্ষমতায় স্থবির—বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টিতে বিদ্যা সেখানে অগাধ হ'লেও জ্ঞান সেখানে শূন্য। বিদ্যা ও জ্ঞানের মধ্যে তফাৎটা গোড়াতেই স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল। তথ্যের যেখানে অভাব নেই সেখানেই বিদ্যা আছে—অন্যের অভিজ্ঞতাকে নিজের মাথায় পুরে রাখা এবং সময় অসময়ে তাকে উদ্গীরণ করাকেই বিদ্যা বলছি। এই বিদ্যা হ'চ্ছে সংবাদবহের কাজ। জ্ঞান হ'চ্ছে নিজের শক্তিতে নিজের সক্রিয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত ও প্রণয়ন করার ক্ষমতা, নিজের অনুভূতির রসে পরের অভিজ্ঞতাকে জারিত করে নেবার শক্তি, সংবাদকে জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার ক্ষমতা। সুতরাং, বিদ্যার পরিচয় আমরা পাই খাতায়-পত্রে, বইয়ের পাতায়, সভায়, মজলিসে; জ্ঞানের পরিচয় কর্ম্মের ক্ষেত্রে, জীবনের আবিলতায় মনুষ্যত্বের সোণার কাঠির স্পর্শে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োজন অনন্ত; মনীষীদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানা অপরিহার্য্য, কিন্তু এইটেই মুখ্য নয়। গান্ধীজী সুন্দরভাবে বলেছেন—Literacy is not the end of education nor even the

beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated. অর্থাৎ লিখতে প'ড়তে জানাই শিক্ষার শেষ কথা নয়, এমন কি তার গোড়ার কথাও নয়। নরনারীকে শিক্ষিত ক'রতে এটা অনেকগুলি উপায়ের একটা মাত্র।

বিদ্যা অনেক থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবন অসুন্দর হয়, তবে সেই বিদ্যাটা কেবল নিষ্ফল নয়, ওটা মারাত্মক। বিদ্যার যেখানে বালাই নেই অলক্ষ্মী সেখানে আসেন নগ্নরূপে, কিন্তু বিদ্যা যেখানে স্বার্থের সহচরী অলক্ষ্মী সেখানে বিচরণ করেন মোহিনী মূর্ত্তিতে। বিদ্যা সেখানে আত্মবিক্রয় করে মিথ্যাচারের কাছে, যুক্তি যোগায় অত্যাচার-অনাচার-অবিচারের। সুতরাং, যে জ্ঞানের উপর ব্যক্তি, জাতি ও মানবসমাজের উন্নতি নির্ভর করে আক্ষরিক জ্ঞান তার প্রাণপদার্থ হ'তে পারে না, সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়েই তেমন জ্ঞান সম্ভব। আরো একটু তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, জীবন যদি সুন্দর হয়, জীবন যদি পূর্ণ হয়, তবে আক্ষরিক জ্ঞানের অভাবও প্রকৃত জ্ঞানের মর্য্যাদা কমাতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান কাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন থেকে এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেতে পারি। যাঁর পক্ষে বিবেকানন্দের মত শিষ্য গড়ে তোলা সম্ভব হ'য়েছিল, এমন ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির যুক্তির জালকে ছিন্ন করে তাঁকে নূতন করে সৃষ্টি করা সম্ভব হ'য়েছিল, তাঁর আক্ষরিক জ্ঞানের পুঁজি সামান্যই ছিল। এই থেকে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, আক্ষরিক জ্ঞান পরিপূর্ণতা ও মঙ্গলের প্রাণপদার্থ তো নয়ই, এমন কি একটি সর্ব্বপ্রধান উপাদানও নয়। পরিপূর্ণ বিকাশের প্রধান বাহন হ'চ্ছে জীবন—যার অভিব্যক্তি হ'চ্ছে কর্ম্মে।

কর্ম্মকে সুসম্পন্ন করতে প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং পূর্ণ বিকশিত মনের। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা ও প্রথম প্রচেষ্টা

হ'চ্ছে সুস্থ দেহ গঠন। রোগজীর্ণ ব্যাধিদুষ্ট দেহে মনের বিকাশ ঘটতে পারে না, এজন্য মনের শিক্ষার গোড়াতেই আমরা দেহের বিকাশের কাজ হাতে নিয়ে থাকি। আমাদের এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া অর্দ্ধভুক্ত ও অভুক্ত বিদ্যার্থীকে পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করার হাস্যকর প্রচেষ্টা আর কোথাও হয়নি। স্বাস্থ্যকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে সকল দেশই স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা ইংরেজদের সময়ে অসময়ে গালাগালি করে থাকি, কিন্তু তারাও তাদের শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা কতখানি ভেবে থাকে তা আমাদের জানা দরকার। যুদ্ধের ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ইংলণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ করিয়ে নিয়েছিল তার এই সম্পর্কিত অংশ একটু দীর্ঘ হ'লেও উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। অনেক আগে থেকেই ইংলণ্ডে বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা চিকিৎসা ও বিদ্যালয়ে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু সেই ব্যবস্থাও শিক্ষার কর্ণধারদের নিকট পর্য্যাপ্ত বলে পরিগণিত হয়নি। এই জন্য তাঁরা চেয়েছেন—

"It is proposed, therefore, to make it the duty of the Local Education Authorities to provide for the medical inspection of all children and young persons attending grant-aided schools and to take such steps as may be necessary to ensure that those found to be in need of treatment, other than domiciliary treatment, shall receive it. No charge will be made for medical treatment for any of these children or young people."

অর্থাৎ—সুতরাং সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে যে সব যুবক এবং শিশুরা পড়াশুনা করে তাদের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করাকে স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হ'চ্ছে

এবং বাসভবনঘটিত চিকিৎসা ছাড়া কারও অন্য কোন রকম চিকিৎসার দরকার হ'লে সে তা' পাবে—এই ব'লে তাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে। এই সব শিশু বা যুবকদের চিকিৎসার জন্যে কোন খরচ নেওয়া হবে না।

বিদ্যালয়ের খাদ্য এবং দুগ্ধ সম্বন্ধে তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন :—

"No less important is the proper feeding of the children. In its origin the power entrusted to Local Education Authorities to provide school meals was designed to prevent the value of education being lost through the inability of children to profit from it through insufficiency of food......The milk in Schools Scheme, whereby children can get milk daily at a cost of a half penny for one third of a pint, or free in cases of poverty, has also been very valuable in underpinning the physical well-being of the children. The extension of both these services will follow from the conversion of the present power of authorities to provide school meals and milk into a duty."

অর্থাৎ শিশুকে উপযুক্ত আহার দেওয়া কম প্রয়োজনীয় নয়। খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যের দরুণ অক্ষমতায় শিশুরা শিক্ষা থেকে লাভবান না হ'তে পারে, এই সম্ভাবনাকে বাধা দেবার অভিপ্রায়ে প্রথমে স্থানীয় শিক্ষায় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে বিদ্যালয়ে খাদ্য জোগাবার ভার দেওয়া হ'য়েছিল.........বিদ্যালয় পরিকল্পনায় শিশু এক-তৃতীয়াংশ পাঁইট পরিমাণ দুগ্ধ আধ পেনি মূল্যে অথবা দারিদ্র্যস্থলে বিনামূল্যে

পেতে পারে। শিশুর দৈহিক মঙ্গলের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই মূল্যবান হ'য়েছে।

উপযুক্ত পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তার কথাও এঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই ব্যবস্থাটিতে তারও বিধান করা হ'য়েছে :—

"There are still many children, specially in large towns who are inadequately clothed or shod and voluntary funds no longer suffice to meet this need. Local Education Authorities will, therefore, be empowered to supply or aid the supply of clothing and footwear for children and young persons attending grant-aided schools (nursery, primary, secondary and special schools), provided they recover the cost in whole or in part from those parents who can afford to pay."

অর্থাৎ বিশেষ ক'রে বড় বড় সহরে এখনও অনেক শিশু আছে যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অনুপযুক্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত দান সে প্রয়োজন মেটাতেও পারছে না। যারা সক্ষম কেবলমাত্র তাদের পিতাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য আদায় ক'রতে পারলেই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে (শিশু, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশেষ বিদ্যালয়) যে সব শিশু এবং যুবকেরা পড়াশুনা করে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং জুতা সরবরাহ বা সাহায্য করার ক্ষমতা স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া হবে।

আর আমাদের দেশে! ধ্বসা দেয়াল, চালের খড় উড়ে যাওয়া, অপরিসর, অন্ধকার, হাড়গোড় বের করা বিদ্যালয়; অবজ্ঞাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীন শিক্ষক; অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত, ম্যালেরিয়াজীর্ণ নিরক্ত বালক-বালিকা দেখেই আমরা অভ্যস্ত। মানুষের এই বীভৎস চেহারা, অনশন-

অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট রোগজীর্ণ দেহটা আমাদের দেখে দেখে এতই স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু করণীয় আছে, তা আমরা ভাবতেই পারি না। আমরা অসহায়ভাবে করজোড়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে সরকারের দোরে ধর্ণা দিই ; নয়ত অসহায়ভাবে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নিজের গৃহকোণেই নিরাসক্ত, নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকি। মাঝে মাঝে এরি মধ্যে দু'-একটা রোগাপটকা, পিলে-সর্ব্বস্ব ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ের বেঞ্চিগুলিকে অবলীলাক্রমে ডিঙ্গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট সগর্ব্বে পেরিয়ে চাকুরী বা ব্যবসার সিংহদ্বারে সার্থকভাবে ঘা মারতে দেখে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি, আর নিজের ঘরের ছেলেটার অকর্ম্মণ্যতায় তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে তার পিঠের উপর সনাতন অধিকার সশব্দে জাহির করি। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার কর্ণধাররা আসেন সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে। কালা আদমীর দেশে আসামাত্র তাঁদের এই জ্ঞানটা টনটনে হ'য়ে ওঠে যে, এ দেশের কালো চামড়ার লোকগুলো মানুষের পর্য্যায়ে পড়ে না। সুতরাং, নিজেদের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা তাঁরা অনায়াসে ভুলে যান এবং নিজ দেশের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতিকে শিকায় তুলে রেখে কালা আদমীর উপযোগী নূতন ব্যবস্থার কথা ভাবতে বসেন। তারই ফলে নিজের দেশের অনুরূপ কর্ম্মের জন্য গৃহীত ভাতার বহুগুণ ভাতা এই দরিদ্র দেশ থেকে আত্মসাৎ করেও এ দেশের শিক্ষক-বিদ্যার্থীর বেঁচে থাকার মত ব্যবস্থাটুকু করার সময়ও রাজকোষের অর্থাল্পতার শিখণ্ডীকে খাড়া করতে ওঁদের কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জা বোধ হয় না।

অনেক দিনের ব্যবস্থাটা এখন শিকড় মেলে, বিরাট ডালপালার অন্ধকার সৃষ্টি করে অতীতকে আবছা করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এই চরম দুর্গতির দেশেও শিক্ষাটা চিরদিন এত অবজ্ঞাত ছিল না।

পল্লীর পল্লব-ছায়ায় সেদিন যে সকল মনীষীরা টোল বা গুরুগৃহ খুলে বসতেন তাঁরা দারিদ্র্যকে ভয় বা ঐশ্বর্য্যকে সমীহ করে চলতেন না সত্য; কিন্তু নিজেদের বা শিষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁদের চিন্তাবিশুষ্ক বিনিদ্র যামিনী যাপন করার প্রয়োজন হ'ত না। রাজ-ভাণ্ডারের প্রতি তাঁদের লোভ ছিল না; কিন্তু বিদ্যার প্রতি রাজন্যবর্গের সম্মান বা বদান্যতার অভাব ছিল না। তাই বর্ত্তমান কালের হতভাগ্য শিক্ষকদের মত উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ না করেও তাঁরা শিষ্যবর্গের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা ভাবতে পারতেন।

বর্ত্তমানকালে আমাদের শিক্ষায় অসাফল্যের একটি প্রধান কারণ হ'চ্ছে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের অভাব। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এরা শিক্ষকের নিকট থেকে স্বল্পই পায় সত্য কিন্তু যেটুকু পায় সেটুকুও গ্রহণ বা ধারণ করার মত শক্তি তাদের থাকে না। যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এদের নেওয়া হোক না কেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি না হ'লে এদের পক্ষে তার দ্বারা লাভবান হ'বার কোন সম্ভাবনাই নেই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা এতদিন একথা তলিয়ে ভেবে দেখেন নি। যে ভিত্তির ওপর সমগ্র ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে তা' আজ ভেঙ্গে পড়ছে। রাষ্ট্রশক্তি হাতে এলে তবে এই বিরাট ফাটলগুলিকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করা যাবে, এই ভেবে এ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থাকা আমার কাছে চরম নির্ব্বুদ্ধিতা বলেই মনে হয়। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্তে গ্রাম উজাড় হ'য়ে যাচ্ছে, বিরাট জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও জাতীয় স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে, খাদ্যাভাব ও রক্তাল্পতায় ভগ্নস্বাস্থ্য মুমূর্ষু শিশুগণ আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের সকল মঙ্গলকে আচ্ছন্ন করে তুলছে—এ অবস্থায় যদি রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে না আসা পর্য্যন্ত এই অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যেই বাস করতে হয়, তবে

ডাক্তার আসার আগেই রোগীকে ইহলোকের আশা ত্যাগ করতে হবে, সমগ্র ভারতের সমাজ-জীবন এমন বিষ-জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠবে যে, তাকে বিষমুক্ত করা সাধ্যাতীত হ'য়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই বিষ থেকে সমাজ-দেহকে মুক্ত করার চেষ্টা হ'য়েছে রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে। এই ব্যবস্থাও স্বাভাবিক ব্যবস্থা নয়। ধনী দরিদ্রের ভেদটা ওসব দেশেও দুর্লঙ্ঘ্য বলে এই ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছে। সেখানে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবিচার আছে বলেই গরু মেরে জুতা দানের ব্যবস্থাটা প্রয়োজন। পিতামাতা সন্তানের অন্নবস্ত্র ভাল-ভাবে জোগাতে পারেন না, সে জন্যই সরকারী বদান্যতার তাদের প্রয়োজন পড়ে এবং সরকারও ব্যবস্থাটুকু করে বাহবা কুড়িয়ে নেন। এখানে নগ্ন সত্যটুকু হ'চ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের যে হাতটা শস্ত্রপাণি, যেখানে শক্তি কেন্দ্রীভূত, সেটা হ'চ্ছে ধনিকের সম্পত্তি। তাই যারা উৎপাদনের প্রাচুর্য্যে জাতির সমৃদ্ধি বিধান করছে দক্ষিণ করে রাষ্ট্র তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়। এই অত্যাচার সেখানে অপ্রতিহত বলে একদল লোক তাদের সন্তান-সন্ততির খাদ্যবস্ত্র উপযুক্তভাবে জোগাতে সমর্থ হয় না, তাই ডানহাতে লুটে আনা ধন বাম হাতে বিলিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র গর্বিত বোধ করার সুযোগ পায়, দরিদ্রের অজ্ঞতার সুযোগে তাদের কৃতজ্ঞতায় ভাগ বসায়।

কিন্তু আমাদের পোড়া দেশের অন্যায়কারীদের সামান্য এইটুকু প্রায়শ্চিত্ত করার মনোবৃত্তিও আমরা আশা করতে পারি না। এদের নির্ব্বুদ্ধিতা এত গভীর যে, এদের প্রাসাদের ভিত্তিও যে ওই নড়বড়ে গ্রাম-সমাজের ওপর তাও লোভের পাশবিকতায় ওরা ভুলতে বসেছে। অন্য দিকে ভিক্ষা নিয়ে ভিক্ষা পেয়ে কোন সমাজ প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করতে পারে তাও আমরা বিশ্বাস করি না। বুনিয়াদী শিক্ষার দাবীটা একটু অন্য রকম। সামান্য পশুপাখীও নিজের খাদ্য আর আবাস

নিজের শক্তিতেই করে নেয়; প্রকৃতি ও প্রাণীসমাজের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার নিপুণতা তাদেরও আছে। শিক্ষা পেয়েও মানুষ যদি এই নিপুণতাটুকু লাভ করতে না পারে, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হ'য়েছে বুঝতে হবে। তাই চিরকাল ভিক্ষার উপর নির্ভর করে থাকার পথকে পরিত্যাগ করার পথই বুনিয়াদী শিক্ষা উন্মুক্ত করে দেয়, আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাশ্রয়ী হ'তে বলে এবং গোড়া থেকে পরাধীনতাকে পরিহার করতে চায়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গোড়াতে হয়ত অজস্র অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু সেটা ভিক্ষা হিসাবে নয়; হয় ধনিক শ্রেণীর এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে, নয় তো ঋণ হিসাবে। এই অর্থ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনে উড়িয়ে দেবার জন্য নয়, জাতীয় সম্পদকে বাড়াবার জন্য।

যাহোক আমরা আমাদের মূল বক্তব্য থেকে খানিকটা সরে এসেছি। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং জীবন গঠনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান বলে গ্রহণ করেছি। এই স্বাস্থ্যের জন্য সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত বস্ত্র, উপযুক্ত পরিশ্রম ও বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই সমস্ত গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম কাজ এবং এজন্য স্বাভাবিক-ভাবেই বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রকে সুরুতেই বিদ্যালয়-গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যেতে হয়। বৃহৎ পূর্ত্ত কার্য্য ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য সুবিধাজনক এবং কোথাও কোথাও অপরিহার্য্য হ'লেও জীবনের মান উন্নয়নের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমগ্র গ্রাম-সমাজের ঐক্যবদ্ধ শক্তিপুষ্ট প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বিদ্যার্থীরা নয় সমগ্র গ্রাম-সমাজ। সুতরাং, বুনিয়াদী শিক্ষকবর্গ কয়েকটি শিশুর ভার নিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে সময় যাপন করতে পারেন না, সমগ্র গ্রাম-সমাজকে সংগঠিত করে তোলা তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

এবারে কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ অবনতির কারণগুলিকে মূলতঃ নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—(১) পরিবেশের অপরিচ্ছন্নতা, (২) দৈহিক ও মানসিক জড়তা, (৩) অনুন্নত কৃষি, (৪) উন্নতিবিহীন গ্রামশিল্প, (৫) সামাজিক অনৈক্য। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই কয়টি কারণই গ্রাম-স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়ে অর্থনৈতিক মুমূর্ষুতার কারণ হ'য়েছে, আবার এই সর্ব্বব্যাপী দৈন্যই গ্রাম-সমাজের চরম দুর্দ্দশা এবং অগ্রগতির সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষকের প্রধান কাজ এই চক্রগতিকে সবলে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলা এবং গ্রাম-সমাজকে এগিয়ে চলার পথের সন্ধান দেওয়া।

পরিবেশের অপরিচ্ছন্নতার প্রধান কারণ এই যে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান আলো, বাতাস, জলকে অজ্ঞতা ও জড়তাবশে বিষাক্ত করে তোলা হ'য়েছে। সমগ্র গ্রাম-সমাজ—ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে—এই মূর্খতার ফলভোগ করছে; কিন্তু কথায় বল্লেই বা এগিয়ে আসছে কে? জীবনের জন্য আত্মপ্রিয়, উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ, সর্ব্বপ্রকার নীচতা—কিছুতেই আমাদের বাধে না, অন্নের চিন্তায় দিবানিশি পশুর মত শ্রম আমরা করি; কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন সুস্থদেহ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সামুদায়িক কাজ করতে আমরা নারাজ। জঙ্গলকাটা, পানা পরিষ্কার করা, মশাকে নির্ম্মূল করা, জলকে শোধিত করা—এগুলি অর্থের ব্যাপার নয়, সঙ্ঘ-বদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপার; কিন্তু এদিকে আমাদের বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য বা আগ্রহ নেই। এমনিভাবে অনুন্নত কৃষিও আমাদের অজ্ঞতার সুযোগে দিন দিন অবনত হ'চ্ছে। গ্রামজোড়া সারের অন্ত নেই, অথচ সারের অভাবে কৃষি দিন দিন ক্ষতিজনক হ'চ্ছে। যা মাটিকে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার—যেমন জীবজন্তুর মল-মূত্রাদি—তা' মাটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি না, মাটির খাদ্যকে কেড়ে রাখছি; অথচ এই দিয়েই রোগের বীজ আমরা

ছড়িয়ে দিচ্ছি গ্রামে গ্রামান্তরে। খাদ্যের অভাবে দৈহিক অবনতি ঘটাচ্ছি, শরীরকে পরিশ্রমের অনুপযুক্ত করে তুলছি, অর্থের অভাবে ঔষধ-পথ্যটুকু পর্য্যন্ত জুটাতে পারছি না, অথচ এই কৃষকপ্রধান গ্রামগুলিতে—যেখানে অধিকাংশ লোকের ছয় থেকে আট মাস একেবারে বসে বসে কাটাতে হয়, সেখানে কোন ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রামে সম্ভব শত শত সমবায় কুটীর-শিল্প গড়ে তুলছি না। শিক্ষকের কাজ বহু শতাব্দীর লালিত এই অজ্ঞতা ও জড়তার মহীরুহকে সমূলে উৎপাটিত করা। এটা সহজ কাজ নয় নিশ্চয়ই।

এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা যে পদ্ধতি গ্রহণ করে তা' প্রচার বা বক্তৃতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বাস করা হয় যে, সমাজের অঙ্গ হিসাবে সমাজের সর্ব্ববিধ কাজে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করার কর্ত্তব্য, দায়িত্ব এবং শক্তি প্রত্যেকের আছে। এজন্য সর্ব্বব্যাপী মৃত্যুর মধ্যে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চিন্ত হ'য়ে পুঁথির পাতা থেকে বড় বড় বুলি মুখস্ত করাকে শিশুর কর্ত্তব্য বলে মনে করা হয় না এবং এই নিশ্চিন্ত বিলাসে তার অধিকার আছে, একথাও অস্বীকার করা হয়। শিশুও সমাজের অঙ্গ, সমাজ-দেহে বিষ-সংক্রমণের সঙ্গে তার জীবন ও ভবিষ্যৎও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—এই সত্যকে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষকের সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা হ'চ্ছে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে এই কথাটা প্রমাণিত করা যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও সম্মিলিত চেষ্টা থাকলে শিশুরাও এই নৈরাশ্যের বিরাট প্রাচীর যে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব তার নিশানা দেখিয়ে দিতে পারে। এজন্য শিশু প্রত্যহ বিদ্যালয়ে এলে সর্ব্বপ্রথমে তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, সারাদিন সর্ব্বকাজে পরিচ্ছন্নতার দিকে যাতে নজর থাকে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা হয়। ফলে শিশুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতার মনোবৃত্তি জেগে ওঠে, পরিবেশের শত ত্রুটির মধ্যে তার এই বৃত্তি দৃঢ়তর হ'তে থাকে। তখন তার

পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতা বেড়ে যায়, নিজের শক্তির উপর বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। নিজের পরিবেশকে সুন্দরতর করার প্রচেষ্টা হয় ব্যাপকতর; নিজের গৃহ পরিষ্কারের প্রচেষ্টায় সে গৃহবাসীদের লজ্জা দেয়, গৃহের নির্লজ্জ নিশ্চেষ্টতাকে মথিত ক'রে তোলে। শিশুর এই শিক্ষাকে আমরা যে-কোন পুঁথিগত শিক্ষার চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করি। অন্য দিকে শিক্ষকের দৃষ্টান্তে গ্রামবাসীদের কুসংস্কারের অচলায়তনের প্রকাণ্ড পাথরগুলিতে সন্দেহের ঝড় এসে লাগে—সন্দেহমিশ্রিত ভয় নিয়ে দোদুল্যমান মনে, বিরক্তিমিশ্রিত লজ্জা নিয়ে এরা এক-পা দু-পা এগিয়ে আসতে থাকে। শিক্ষক চলেন তেমনিভাবে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে, অনুর্ব্বর জমিতে ফসল ফলিয়ে, গ্রামেরই কামার দিয়ে উন্নততর লাঙ্গল-কাস্তে তৈয়ার করে, ম্যালেরিয়ার মধ্যে নির্জ্জর থেকে, সকলের সুখদুঃখের শ্রোতা, উপদেষ্টা বন্ধু হ'য়ে। এমনি করে গ্রাম-সমাজে প্রাণ সঞ্চার করে বুনিয়াদী শিক্ষা, এমনি করে অদৃশ্য স্রোত ক্রমে রূপ নেয়—গ্রামের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে পড়ে, নালা ডোবা সংস্কৃত হয়, গ্রাম আশায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, আগ্রহে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়, অদৃষ্টকে জয় করে নূতন ভাগ্য রচনা করে। ভিক্ষা নয়, করুণা নয়, নিজের স্বাধীন বিরাট শক্তিময় সত্তার পরম উপলব্ধির আনন্দে নবজীবনের অমৃতস্বাদ পেয়ে ভাবীকালের উদয়াচলের রঙীন আভার দিকে নিঃশব্দে চোখ মেলে।

বুনিয়াদী শিক্ষা যে সব জায়গায় সত্যিকারের শিকড় মেলতে পেরেছে, শিক্ষক যেখানে সত্যই 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়'—এই নীতি অবলম্বন করে চলতে পেরেছেন, সেখানে এই সম্ভাব্যতা কেবলমাত্র কল্পনাবিলাস বা গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের ষষ্ঠ ও সপ্তম বার্ষিক বিবরণীতে আমরা এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পেতে পারি। বিহারে বেতিয়া থানায় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি আছে

সেগুলি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পরিদর্শকদের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কিভাবে সন্দেহাতুর গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান রাজ্য। সেখানে কিভাবে গ্রামবাসীরা এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছেন তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কাশ্মীরের বিবরণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে সাম্প্রদায়িক ব্যাধি আমাদের কাছে আজ 'শিবেরও অসাধ্য' বলে মনে হচ্ছে, তা' সত্যি সত্যি শরতের মেঘ ছাড়া আর কিছু নয়।

শিশুর স্বাস্থ্য—খাদ্য ও বস্ত্র

বিদ্যার্থীদের সুস্থ দেহ গড়ে তোলার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিভাবে ও কি চেষ্টা করা হয়, এবারে তারই আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সুস্থ দেহের জন্য চারটী জিনিষ একান্ত প্রয়োজন: (১) পর্য্যাপ্ত অন্নবস্ত্র (২) পরিচ্ছন্নতা (৩) উপযুক্ত পরিশ্রম (৪) যথেষ্ট বিশ্রাম। আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব একান্ত ব্যাপক। বস্ত্রহীনতার জন্য শিশুরা অনেক সময় বিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত আসতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে পুষ্টিকর খাদ্য জোটে, এমন লোকের সংখ্যা তো আঙুলে গোণা যায়। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অধিকাংশ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন অপুষ্ট হ'য়ে থাকে। খাদ্যভাবে ক্লিষ্ট শিশুর পক্ষে বিদ্যা গ্রহণ ও জীর্ণ করা অসম্ভব এবং এ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের যে কিছু করণীয় আছে, তা আমাদের চিন্তার সম্পূর্ণ বাইরে। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে কারো পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই নেই। শতবিধ কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে অপরিচ্ছন্নতাকে আমরা কায়েম

করে রেখেছি। খানা-ডোবায় গ্রাম ভরা ; পুকুরে পানা-পচা দুর্গন্ধ জল, আর সেই অপরিচ্ছন্ন জলেই চলে স্নান, বাসন মাজা, গরু-মহিষ ধোয়ান ইত্যাদি—জুতা সেলাই থেকে সুরু করে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সকল রকমের কাজ। ঘরে যাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান একটুখানি আছে তারা পরিশ্রমকে ভয় করে জুজুর মত, এড়িয়ে চলতে চায় সর্ব্বতোভাবে ; আর অন্নের সংস্থান নেই যাদের তাদের খাটতে হয় ভূতের মত, মাথার উপর তুলে নিতে হয় নির্ব্বিচারে সকল কাজের প্রকাণ্ড বোঝাটা, যা সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টায় করণীয়।

সুস্থ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় এই চারটি জিনিষের সংস্থান করার চেষ্টা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিভাবে করা হয়, এবার পর্য্যায়ক্রমে তারই আলোচনা করা হবে।

প্রথমতঃ, বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অসহায় পরনির্ভরতা যে কেবল মাত্র আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক তা নয়, পরন্তু অসহায় পরনির্ভরতার এই ছিদ্রপথে সমাজে নানা দুর্নীতি ও শোষণের প্রবেশ সম্ভব হ'য়েছে। কালোবাজারে এই একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি যে কেউ ২৲ টাকা দামের বদলে ১০৲ টাকায় বিক্রী করতে সাহস পায়, তার কারণ এই যে, দোকানী জানে যে, ক্রেতা এ বিষয়ে একেবারে অসহায়। বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজ অচল ; লজ্জা ছাড়াও প্রয়োজনের দিক থেকে বস্ত্রের মূল্য কম নয়। অথচ বস্ত্র উৎপাদনের চাবিকাঠিটি আমরা বিবেকহীন শোষকদের হাতে তুলে দিয়েছি। এজন্য গুদামে যখন কাপড় পচে তখন বস্ত্রের অভাবে পুরনারীর আত্মহত্যার সংবাদ শোনা সম্ভব হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র হ'চ্ছে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। ভিক্ষা দিয়ে বিদ্যার্থীর বস্ত্রাভাব মেটাবার চেষ্টা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে করা হয় না। তাকে শেখানো হয় কি করে পূর্ব্বপুরুষদের অবিবেচনাপ্রসূত আলস্যের জন্য বস্ত্র উৎপাদনের পরিত্যক্ত কৌশলটী আবার আয়ত্ত করা যায়।

পূর্ব্ব-বুনিয়াদী বর্গে ই—অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়স হবার আগেই—শিশু কার্পাস অথবা তূলা পরিষ্কার করতে শেখে। যেখানে সম্ভব এই সময়ের মধ্যেই শিশুকে গাছ থেকে কার্পাস চয়নের কৌশল শিখিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শিশু মনের আনন্দে প্রভাতের রৌদ্রকরোজ্জ্বল মাঠে কার্পাস চয়ন করে বেড়ায়। ৭ বৎসর বয়স হ'তে না হ'তেই শিশু বাগানের কাজে সহায়তা করতে সুরু করে। তখন তাকে দেওয়া হয় গাছ-কার্পাসের বীজ বুন্‌তে। গড়ে একজনের জন্য দু'টা কার্পাস গাছই যথেষ্ট। বাড়ীতে আমাদের আগাছাপূর্ণ জঙ্গলের অভাব নেই। সাধারণতঃ এরা মশকের আশ্রয়স্থল, সাপখোপের বিহারভূমি হ'য়ে থাকে। তারই মধ্যে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে কার্পাসের বীজ বোনা হয়। ২ বৎসরের মধ্যে তা থেকে তূলা সংগ্রহ করা চলে। অন্যদিকে কার্পাসের বীজ থেকে আমাদের দেশের দুর্ভাগা পুষ্টিহীন গরুর একটি পরম পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করা চলে, আগাছা পরিষ্কারের ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি তো খানিকটা হয়ই। বিদ্যার্থীদের ১২ বৎসর বয়স হবার আগেই তারা দৈনিক শুধু মাত্র আধঘণ্টা সূতা কেটে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় তৈরী করার মত সূতা কেটে নিতে পারে। এ সময়ে এদের ঘণ্টায় সূতা কাটার গড় গতি থাকে ৩২০ তার বা আধগুণ্ডী। সুতরাং, আধ ঘণ্টায় এরা ১৬০ তার বা এক লট্টি সূতা কাটতে পারে। দৈনিক এই হারে সূতা কাটলে বৎসরে প্রত্যেকের সূতার পরিমাণ দাঁড়ায় সওয়া ৯১ গুণ্ডী। ১১-১২ বৎসরের বিদ্যার্থীরা সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৬ নম্বরের সূতা কাটে। এই সূতার মোটামুটি ৪ গুণ্ডীতে এক বর্গ গজ কাপড় তৈরী হ'তে পারে। সুতরাং, ৯০ গুণ্ডী সূতা থেকে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর জন্য বৎসরে ৯০ ÷ ৪ = ২২॥০ সাড়ে বাইশ গজ কাপড় তৈরী হ'তে পারে। আমাদের দেশে আজকাল গড়ে মাথা পিছু কাপড়ের বরাদ্দ মাত্র বার গজ; গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ক'রে

এটুকুও মেলান ভার। তার উপর মিল হওয়া সত্ত্বেও এখনও বিদেশ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড়ের প্রায় অর্দ্ধেক আমদানী ক'রতে হয়। ফলে গরীব দেশের রক্ত-জলকরা কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলে যায়। অথচ অল্প একটু পরিশ্রমের বদলে বর্ত্তমান সরকারী বরাদ্দের চাইতে অনেক বেশী কাপড় ঘরে তৈরী করা চলে, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে টাকার মহাপ্রস্থানের একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গপথও রুদ্ধ করে দেওয়া যায়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্গের বিদ্যার্থীরা নিজের সূতায় নিজেদের কাপড় বুনার কাজ নিজেরাই করে। ২ জন বিদ্যার্থীর (১২ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের) ১২ বর্গ গজ কাপড় তৈরী করতে গড়ে ৪ দিন সময় লাগে। দিনে ৬ ঘণ্টা ক'রে কাজের সময় ধরলে ১২ বর্গ গজ কাপড় তৈরী করতে একজন বিদ্যার্থীর ৪ × ৬ × ২ = ৪৮ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। অর্থাৎ একজন বিদ্যার্থীর ১ বর্গগজ কাপড় তৈরী করতে ৪৮ ÷ ১২ = ৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। সুতরাং, একজন বিদ্যার্থীর ২২॥ গজ কাপড় তৈরী করার জন্য বৎসরে ২২॥ × ৪ = ৯০ অর্থাৎ মাসে ৯০ ÷ ১২ = ৭॥ ঘণ্টা। সুতরাং, সূতা কাটার পর সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়া সহ কাপড় বুনার কাজের জন্য একজন বিদ্যার্থীর গড়ে প্রতিদিন ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব যদি ধরা যায় যে, কার্পাস চয়ন থেকে তূলা বোনা, পাঁজ করা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার জন্য দৈনিক গড়ে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়, সূতা কাটার জন্য দৈনিক গড়ে আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয় এবং সূতা কাটার পর কাপড় তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করতে দৈনিক ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তবে সর্ব্বসমেত মিলিয়ে দৈনিক গড়ে ১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করলে প্রত্যেক ১৪-১৫ বৎসরের কিশোর-কিশোরী নিজেদের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে।

ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাপড়ের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত

অল্প। কিন্তু ধনীর ঘরণীরা এ সত্য সহজে উপলব্ধি করতে চান না। পর্য্যাপ্ত বস্ত্র জোগাবার অজুহাতে তাঁরা চান আষ্টে-পৃষ্ঠে কাপড় মুড়ে শিশুকে তাঁদের ধনমহিমার জীবন্ত একটি বিজ্ঞাপন করে তুলতে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একদিকে বিদ্যার্থীদের বস্ত্র-স্বাবলম্বী করে তাদের স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত পরিধেয়ের ব্যবস্থা করার শিক্ষা দেওয়া হয়, অন্যদিকে বস্ত্রভারক্লিষ্ট শিশুর নিরর্থক বস্ত্রের বোঝা কমিয়ে তাকে আলো-বাতাসের স্বাস্থ্যকর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। বস্ত্রের সঙ্গে কাঞ্চন-কৌলিন্যের সম্পর্কচ্ছেদ করে তাকে স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার চেষ্টা করা হয়।

বস্ত্রের পরেই আসে অন্নের প্রশ্ন। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই পুষ্টিকর সুসম খাদ্য জোটে। আমরা হয় অর্দ্ধাহার অনাহার নয় অতি আহারের কবলে কবলিত হয়ে থাকি। আমাদের অজ্ঞতার জন্য যদিচ আমরা বুঝতে পারি না, তবু প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সুসমঞ্জস খাদ্য গ্রহণের একটা সুন্দর রীতি গড়ে উঠেছিল। খাদ্য বিষয়ে অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদের প্রাচীন ব্যবস্থার কথাও ভুলেছি। খাদ্য সম্পর্কে তাই আমাদের যেমন অভাবের কমতি নেই, তেমনি অপচয়েরও শেষ নেই।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি প্রাথমিক কর্ত্তব্য হচ্ছে খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় যে সকল উপাদান ঘরে জোটে না বিদ্যালয়ে তা পূর্ণ করে দেবার চেষ্টা করা। আমাদের দেশে বস্ত্রের অভাব শিশুর পক্ষে তেমন মারাত্মক হয় না, তাই বস্ত্র সম্পর্কে শিশুকে স্বাবলম্বী হওয়ার মত সময় দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমাদের সমাজ-দেহে ঘুণ ধরেছে। খাদ্যের অভাবে কর্ম্মশক্তি কমে যাচ্ছে, সমাজের উৎপাদন কমছে, রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার অভাবে নিত্য রোগপ্রপীড়িত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে; ফলে

সমগ্র গ্রাম্য সমাজ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে চরম বিপর্য্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বলরামপুর গ্রামটিতে প্রায় ৩০০ পরিবারের বাস। গত ছয় মাসের মধ্যে আমরা ১০টি পরিবারে ক্ষয়রোগাক্রান্ত রোগী পেয়েছি। অনেক পরিবারেই কোন পরীক্ষা করা এখনও সম্ভব হয় নাই। সমগ্র গ্রামটিতে ক্ষয়রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে; কারণ, এই সব রোগীকে আলাদা করে রাখার বা কোন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করার ব্যবস্থা এখানে নেই। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা করার আগে যে কোন প্রকারে শিশুর প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা করে ভবিষ্যৎ সমাজকে অনিবার্য্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

আমাদের শিশুদের প্রধান অভাব দুধের। অবজ্ঞাত, গুরু কর্ম্মভার-প্রপীড়িত, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীনা জননীর স্তন্যদুগ্ধ শিশুর প্রায়শঃ জোটে না। অন্যদিকে বহু গাভী ঘরে থাকলেও দুধের পাত্র শূন্যই থাকে; পুষ্টিকর খাদ্যহীন, অযত্নলালিত, অজ্ঞতায় অবজ্ঞাত গাভীর অবস্থা গৃহস্বামিনী অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল থাকে না। যদি কোথাও গরু মারফৎ দু'চার ফোঁটা দুধ জোটে তাহ'লেও সে দুধ শিশুর অদৃষ্টে জোটে না, দুধটুকু চলে যায় সহরে পণ্যরূপে অথবা ধনীর রন্ধনশালায়। সেবাগ্রামে দীর্ঘকালের যত্নে নিজেদের গোশালা থেকে গ্রামের বিদ্যালয়ের শিশুদের রোজ এক পোয়া করে টাট্‌কা দুধ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাংলা দেশে সে সম্ভাবনা এখনও দূরবর্ত্তী। এ বিষয়ে আমরা বর্ত্তমানে বঙ্গীয় রেডক্রশ সোসাইটির সাহায্য গ্রহণ করছি। এঁরা আমাদের দুগ্ধচূর্ণ ও ভিটামিনের বড়ি দিয়ে থাকেন। এ থেকে রোজ এক পোয়া করে দুধ এই গ্রামের বিদ্যার্থীদের দেওয়া হয়। চূর্ণ দুধের খাদ্যপ্রাণের অভাব ভিটামিনের বড়ি দিয়ে পূরণ করা হয়। ১৯৪৭এর মে মাস থেকে বিদ্যালয়ের শিশুদের একবেলা 'জলখাবার' দেওয়া বিষয়েও রেডক্রশ সোসাইটি আমাদের সাহায্য করছেন। এ থেকে

নারকেল, চিঁড়া, ফলমূল দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে জলখাবার দেওয়ার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যের কতটা উন্নতি হবে তা বোঝার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু নিয়মিত দুগ্ধ গ্রহণের ফলে যে শিশুদের অসামান্য উন্নতি হতে পারে, তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে এই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করব। আমাদের কেন্দ্রের ঠিক পাশের বাড়ীতে জবা বলে একটি মেয়ে থাকত। মেয়েটির বয়স ১৯৪৫ সালে ১০ বৎসর ছিল। রোজ মেয়েটির জ্বর হত, এত রোগা ছিল যে মনে হতো বাতাসে উড়ে যাবে। মেয়েটিকে দেখলে তার বয়স ৭।৮ বছরের বেশী মনে হতো না। ও এত দুর্ব্বল ছিল যে, ভাল করে চলে ফিরে বেড়াতে পারত না। পেটে প্রায় ৮ আঙ্গুল বড় প্লীহা ছিল। দুর্ব্বলতার জন্য একটু জড়িয়ে কথা বলত। প্রথমে নিয়মিত কুইনাইন খাইয়ে মেয়েটির জ্বর বন্ধ করা হয়। তারপর আমাদের শিবিরে গ্রামের বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা হলে ওকে নিয়মিতভাবে দুধ দেওয়া হতে থাকে। ফলে আজ মেয়েটি আমাদের বিদ্যার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ওর প্লীহা সেরে গেছে, চোখমুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফিরে এসেছে। কথার জড়তাও ওর এখন একেবারেই নেই। ওজন নেবার যন্ত্র সে সময়ে আমাদের না থাকায় নিয়মিতভাবে বিদ্যার্থীদের ওজন নেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু এ মেয়েটির ওজন যে অনেকটা বেড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু দুগ্ধ দানের এ ব্যবস্থা যে ভিক্ষা করে সাময়িকভাবে একটা সর্ব্বনাশ বন্ধ করার ব্যবস্থা মাত্র সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। আমরা জানি যে, এ ক্ষেত্রে একটা খুব বড় মূল্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। এজন্য গোশালা তৈরী ও গোধনের উন্নতি বিধান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার একটা আবশ্যিক অঙ্গ। সাধারণ গরুকে যে বৈজ্ঞানিক ভাবে

খাদ্য ও যত্ন দিয়ে কল্পনাতীতভাবে উন্নত করা যায়, তার প্রমাণ সেবাগ্রামে পাওয়া গেছে। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মারফৎ এই পরীক্ষার প্রয়োগ চলতে থাকবে।

আমাদের খাদ্যের দ্বিতীয় অভাব হচ্ছে প্রচুর টাটকা শাকসব্জী ও ফলের অভাব—বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে—প্রধানতঃ অজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রসূত। এই অঞ্চলে জমি বা জল কোনটারই অভাব নেই, কিন্তু এগুলি ব্যবহার করার মত লোক জোটে না। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে যখন বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র বলরামপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সারা গ্রামে সামান্য মাত্রও শাকসব্জী উৎপন্ন হত না। লোকের একটা অহেতুক ধারণা ছিল যে, এখানকার মাটিতে শাকসব্জী হয় না, আর যাও হতে পারে তাও হনুমানের হাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব। প্রথম বৎসর আমরা আমাদের জমিতে কপি, ট্যমাটো, বেগুণ, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা ও করলার চাষ করি। ঐ বছর সামান্য মাত্র সার ব্যবহার করা হয় ও মানুষের মলমূত্র থেকে সার তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ট্রেণিং কেন্দ্রের বিদ্যার্থীরা আনুমানিক ৩০০৲ টাকা মূল্যের শাকসব্জী দশ মাসে উৎপাদন করেছে। এখানে আম, পেঁপে, কলা, তরমুজ, শশা, আতা, কালজাম প্রভৃতি ফল অতি সহজেই জন্মানো যায়। এই গ্রামেই একটি বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড ফলের বাগান আছে এবং সেখানে নানাপ্রকার ফল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। অথচ গ্রামের লোক বাড়ীতে ফলের গাছ লাগাবার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেয় না। এর পরিবর্ত্তে বাড়ীগুলি ভর্ত্তি থাকে বাঁশঝাড়ে। যার প্রসাদ হচ্ছে ম্যালেরিয়া, পেটের অসুখ, যক্ষ্মা। মানুষ যে নিজের অজ্ঞতা ও আলস্যের জন্য নিজেদের সামনে স্বর্ণপ্রসূ ভূমি রেখেও না খেয়ে শুকিয়ে ওঠে তার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পেতে পারি সেবাগ্রামে। আজ যেখানে দৈনিক তিন মণের উপর সব্জী উৎপাদিত হয়, গান্ধীজী
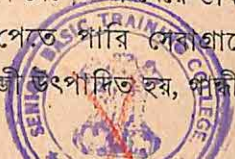
সেবাগ্রামে ঘর বাঁধবার আগে সেই জমি শুষ্ক মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করত। ২।৩টি পরিবারের প্রয়োজনীয় সামান্য তরিতরকারীও গ্রাম থেকে কিনতে পাওয়া যেত না। সব্জী ও ফল উৎপাদনে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পর গ্রামবাসীরা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। এ-বছর কয়েকটি বাড়ীতে কিছু কিছু কপি, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির চাষ হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়ীতে এবার শীতকালে কিছু না কিছু শাকসব্জী উৎপাদন করেছে। বিদ্যালয়ে তারা যেটুকু উৎপাদন করেছে, তাতে দু'দিন তারা চড়ুই-ভাতি করেছে, প্রত্যেক বিদ্যার্থী বাড়ীতে অন্ততঃ দুটো করে কপি নিয়েছে, আধমণ ট্যমাটো বিক্রী করেছে; এ ছাড়া প্রত্যেক বিদ্যার্থী প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ট্যমাটো দু'মাস ধরে খেয়েছে। এইভাবে বাগানের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের খাদ্যের ঘাটতি দূর করার চেষ্টা করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পঞ্চম বর্গের বিদ্যার্থীরা সুবিধামত কৃষিকাজকে মূল শিল্পরূপে গ্রহণ করে কাজ সুরু করে। এই শিল্পের মারফতে যে কেবল তারা শাকসব্জী সম্পর্কে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তাই নয়, পরন্তু এ সকল কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থে তারা শিক্ষকের মাসিক ভাতার সংস্থানও প্রায় সম্পূর্ণরূপে করতে পারে দেখা গেছে। সেবাগ্রাম ও বিহারে এ সম্পর্কে পরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফলাফল থেকে এ সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

খাদ্য সম্পর্কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তৃতীয় চেষ্টা হচ্ছে অপচয় নিবারণের। পাকশালার কাজ এজন্য প্রত্যেক বিদ্যার্থীর পক্ষে একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। সাধারণতঃ আমাদের গ্রামের বাড়ীগুলিতে একই ডাল ভাত রান্না করা হয়ে থাকে। অথচ এই সামান্য রান্নার জন্য যে কি পরিমাণ সময়, শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তা ভেবে দেখার বিষয়। ছোটবেলা অবধি বাড়ীতে মায়েদের রান্না ঘরে প্রায় সারাদিন কাটাতে

দেখেছি। যদি খুব কম করেও ধরা যায় তবুও রুগ্নদেহ বউঝিদের কার্ব্বণডায়ক্সাইড-পূর্ণ একান্ত অবৈজ্ঞানিক রান্না ঘরে দৈনিক অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা করে কাটাতে হয়। এ সময়ের মধ্যে ৫জন লোক ৩০টি পরিবারের সাধারণ রান্না করতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রত্যেক পরিবারের রান্নার জন্য মাত্র একজন লোকের দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে সময় ব্যয়িত হয় তবে ৩০টি পরিবারে ৩০জনের ৩০ × ৬ = ১৮০ ঘণ্টা সময় প্রত্যহ লাগে। এর মধ্যে ৫ × ৬ = ৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে যদি এই রান্নাপর্ব্ব শেষ করা যায় তবে দৈনিক ১৫০ ঘণ্টা সময়ের অপব্যবহার বাঁচে। ঘণ্টায় এক আনা উপার্জ্জন করলেও দেড়শ' ঘণ্টায় ৯৷৵০ আয় হতে পারে। এর মানে রান্না পর্ব্বটা বাড়ীতে বাড়ীতে আলাদা করে না রেখে সম্মিলিত রান্নার ব্যবস্থা হলে ৩০টি পরিবারের বছরে ৯৷৵০ × ৩০ × ১২ = ৩৩৭৫৲ আয় বৃদ্ধির উপায় করা চলে। এতে স্বাস্থ্য, কাঠ-কয়লা ইত্যাদি জ্বালানীর ব্যয়, আলাদা আলাদা রান্নাঘর তৈরীর খরচ, বাসন-কোসনের ব্যয় যে কত কমে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। কি ভাবে পালাক্রমে রান্নার ভার নিয়ে সামুদায়িক রান্নাঘরের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করা যায় তা প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সম্ভবপর হলে শেখানোর চেষ্টা করা হয়।

খাদ্যের দ্বিতীয় অপচয়ের পথ হচ্ছে ক্রয় ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থার ছিদ্রপথে। জিনিষপত্র আমরা কিনি আন্দাজে, হিসাব করে নয়। ফলে অনেক সময় বাধ্য হয়ে অপচয় করতে হয়। অন্যদিকে ভাঁড়ারে জিনিষপত্র রাখার ব্যবস্থাও আমাদের একান্ত অবৈজ্ঞানিক। কি ভাবে বিভিন্ন বস্তুকে সংরক্ষণ করতে হয়, তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদের জানা নেই। ফলে তরিতরকারী, আচার, মোরব্বা ইত্যাদি অযথা নষ্ট হয়। ভাঁড়ারের হিসাব রাখা, খাদ্য বিভাগের বাজেট তৈরী করা, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপর আলো, বাতাস, উত্তাপ, আদ্র`তা ইত্যাদির প্রভাব

সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের জ্ঞান দিয়ে এই অপচয় বন্ধ করার শিক্ষা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় ও সব চেয়ে ভয়াবহ অপচয়ের পথ হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন ও রন্ধনের মধ্য দিয়ে। আজও আমরা পালিস করা, কলে ছাঁটা, পরিষ্কার চাল খাবার মোহ ছাড়তে পারিনি। কলের চালে চালের খাদ্য-উপাদানের যে কতখানি অপচয় ঘটে তা আমরা ভেবেও দেখিনা। তাই গ্রামাঞ্চলেও নানা স্থানে ব্যাঙের ছাতার মত চালের কল গজিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে। ডাল আমরা ভেজে খেতে ভালবাসি, কাঁচা শাকসব্জী আমরা খাই না। চিড়া, নারিকেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদির পরিবর্ত্তে হালুয়া-লুচি আজ আমাদের 'জল-খাবারের' স্থান গ্রহণ করেছে। ফলে চালের শর্করা ব্যতীত অন্য সকল খাদ্য-উপাদান আমরা ছেঁটে ফেলে দিই। বস্তুতঃ চালের আইওডিন, প্রোটিন ইত্যাদি মূল্যবান খাদ্য-উপাদান প্রায় আমরা শতকরা ৮০ ভাগ আমাদের অজ্ঞতার জন্য নষ্ট করে ফেলি। ডালের প্রোটিন ভাজার ফলে দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের খাদ্যের কোন যোগ নেই; আমরা খাদ্য গ্রহণ করি উদরপূর্ত্তি ও চক্ষু এবং জিহ্বার তুষ্টির জন্য। এই অপচয় আমাদের রন্ধন-প্রণালীর জন্য আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমরা খোলা পাত্রে ডাল, ভাত ইত্যাদি রাঁধি। ফলে জলে দ্রব খাদ্যপ্রাণগুলি বাষ্পের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সেদ্ধ করা তরকারীর জল, ভাতের ফেন আমরা ফেলে দেই; ফলে জলে দ্রব বহু খাদ্য-উপাদান নষ্ট হয়। অনেক জিনিষই আমরা প্রথমে ভেজে পরে খোলা পাত্রে জলে সেদ্ধ করি। ফলে খাদ্যের প্রোটিন অংশ দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে এবং খাদ্যপ্রাণের জলে ও তেলে দ্রব সবটুকুই পালিয়ে যায়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও রুচি এবং সংস্কারগত লোভের জন্য আমাদের আহার কলার শাসটা ফেলে খোশা খাওয়ার মত

হয়ে দাঁড়ায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আহার ও আহার্য্য প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আজ ভারতবর্ষে যখন খাদ্যের একান্ত অভাব তখন এ ভাবের অপচয় ক্ষমার অযোগ্য। অথচ আমাদের ঘরে ঘরে এই অপচয় প্রত্যহ চলছে। আহারের রুচির সামান্য অদল বদল করে, উন্থন তৈরীকে আর একটু বিজ্ঞানসম্মত করে, বাষ্পের দ্বারা রান্নার ব্যবস্থা করে সহজেই এই সকল অপচয় বহুল পরিমাণে দুর করা যায়। বলরামপুরে এ বছর কি করে খরচ একই রেখে উন্নততর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়, এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ স্বরু করা হয়েছিল। ফলে বছরের শেষে খাদ্য খরচ কমিয়ে অনেক বেশী ক্যালরীযুক্ত ও বহু গুণে অধিক সুসম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে বিদ্যার্থীরা সক্ষম হয়েছিল। একটু সুচিন্তিতভাবে কাজ করার ফলে বিদ্যার্থীরা ২৪০০ ক্যালরীর পরিবর্ত্তে ২৭০০ ক্যালরী, ছানা ৪ তোলার পরিবর্ত্তে ৬·৮৮ তোলা, মাখন ১।২ তোলার পরিবর্ত্তে ৩·৯১ তোলা পেতে পেরেছিল। অথচ এতে খাদ্য বিভাগের খরচ বাড়তির দিকে না গিয়ে বরং কমতির দিকেই গিয়েছিল।

এভাবে খাদ্যের অভাব পূর্ণ করে, নূতন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে এবং খাদ্যের অপচয় নিবারণ করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি করার চেষ্টা করা হয়। রান্না ঘরের কাজটা আবশ্যিকভাবে শেখাবার ব্যবস্থা করার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অন্ততঃ এক বেলার আহারও যাতে শিশু বিদ্যালয়ে করে তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়ে থাকে। যেখানে এ ব্যবস্থা সম্ভব হয় না, সেখানেও এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে শিক্ষক প্রত্যেক পরিবারকে এক সঙ্গে উপদেশ দেবার চেষ্টা করেন; প্রত্যেক গৃহে উন্নততর খাদ্য ও দেহ-বিজ্ঞান সম্মত রান্না প্রচলনের চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাসে দু'মাসে এক একটা উৎসব উপলক্ষে চড়ুইভাতি বা

গ্রাম-ভোজের ব্যবস্থা করে শিশুদের এ সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের মামুলী ধরণের বিদ্যালয়ে শিশুর স্বাস্থ্যের এদিকগুলি একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। শিক্ষকেরা হয়ত হাড়ে হাড়ে অনুভব করেন যে, ক্ষুৎপীড়িত, অর্দ্ধাশন, অনশনে জড় বালকবালিকার পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু তাঁরা হয়ত ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে, এ সম্পর্কে ভাবা তাঁদের কর্ত্তব্যের বাইরে এবং এ সম্বন্ধে কিছু করা তাঁদের ক্ষমতার অতীত। স্বাস্থ্যই যে শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ার কথা আর অন্নবস্ত্রের সংস্থানই যে এ বিষয়ে প্রধান করণীয় এবং এ বিষয়ে ভাববার ও করবার যে অনেকখানি রয়েছে, এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম সম্পাদ্য। বুনিয়াদী শিক্ষা এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের মত রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হতে অস্বীকার করে এবং নিজের স্বাধীন প্রচেষ্টার উপর দাঁড়িয়ে নিজের অপরিহার্য্য প্রয়োজন মেটাবার শিক্ষা প্রথমাবধি দেয়।

শিশুর স্বাস্থ্য—পরিচ্ছন্নতা

অন্নবস্ত্রের পরেই আসে সাফাইর কথা। 'সাফাই' কথাটা শুধু 'পরিচ্ছন্নতা' থেকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেবল মাত্র কুশ্রীতা বা আবর্জ্জনা দূর করাই সাফাই নয়, সাফাইর অর্থ সকল কুশ্রীতা, অসৌন্দর্য্য দূর করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাফাইকে সকল কাজের প্রাণবস্তু বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সাফাইর কাজকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করে নেওয়া চলে :—
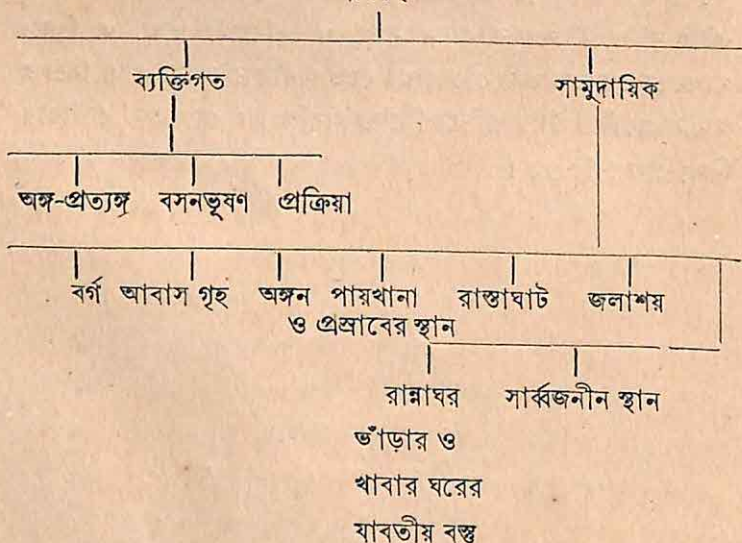
আলপনা দেওয়া, গৃহসজ্জা, উৎসব ও সভার স্থান সাজান—এই সমস্তই সাফাইর অন্তর্ভুক্ত।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাফাইকে কেবলমাত্র একটা পুঁথিগত

বিদ্যার পর্য্যায়ে না রেখে একটা জীবন্ত অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। শৈশবেই আমাদের অভ্যাসগুলি গড়ে ওঠে ও জীবনের জমিনে মূল বিস্তার করে। এজন্য পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান ও অভ্যাস গড়ে তোলার দিকে এ সময়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। ছোট বেলা থেকেই এমন অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় যাতে যে-কোন রকম অপরিচ্ছন্নতা শিশুর পক্ষে অসহ্য হয় এবং সক্রিয়ভাবে সেই অপরিচ্ছন্নতা দূর করার চেষ্টা না করে সে স্থির থাকতে না পারে। আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে পরিচ্ছন্নতার পাঠ দেওয়া হয় বটে কিন্তু এ সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে কিছু করার দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করে না। ফলে অনেক সময় যে বিদ্যার্থী স্বাস্থ্য-রক্ষার পরীক্ষায় প্রথম হয় তার পক্ষে অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসেও প্রথম হওয়ার কোন বাধা থাকে না। এমন বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখেছি যেখানে গরুর গোবর, ছাগলের নাদাপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় ঘরে বসেই শিক্ষক মশাই বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্যরক্ষার পাঠ দিচ্ছেন অথবা অপরিচ্ছন্নতার কুফল সম্পর্কে বুলি আওড়াচ্ছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা কার্য্যকরীভাবে দেওয়া হয়ে থাকে ; বিদ্যালয়, গ্রাম বা বিদ্যার্থীর যে-কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা শিক্ষকের পাঠদানের উপলক্ষ হয়ে থাকে। অতএব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের ক্রম হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় কোথাও বিন্দুমাত্র অপরিচ্ছন্নতা থাকলে তা তৎক্ষণাৎ দূর করে এবং এই অপরিচ্ছন্নতার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত ও যথোপযুক্ত আলোচনা করে।

প্রথমতঃ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কথা ধরা যাক। সাধনাশ্রমে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে হাজিরা খাতা রাখা হয় তার নমুনা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

আগষ্ট মাস

ক্রমিক নং	নাম		তারিখ					
			১	২	৩	৪	৫	
১।	অনুজন	কোষ্ঠ						
		হাত-পা						
		কাপড়-চোপড়						
		নাক						
		কাণ						
		নখ						
		দাঁত						
		চুল						
		আসা						
		যাওয়া						

পূর্ব্বোক্তরূপ হাজিরা বই ফুলস্কেপ আকারের খাতায় করা হয়। এক পৃষ্ঠায় ৬ জনের হিসাব রাখা চলে। পাশাপাশি দুই পৃষ্ঠায় তিন মাস চলে যায়। সাধারণতঃ দিনে দু'বেলা বিদ্যালয়ে কাজ হয়, সুতরাং, প্রত্যেক বেলা একটা বিশেষ চিহ্ন দিয়ে উল্লিখিত জিনিষগুলি ঠিক আছে কিনা তার হিসাব রাখা হয়। আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। দেরী এলে'—'এই চিহ্ন দিয়ে পাশে কত মিনিট দেরী তা লিখে দেওয়া হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক সাধারণতঃ ২৪ জন বিদ্যার্থীর ভার নিয়ে থাকেন। প্রত্যেক বর্গে বিদ্যার্থীদের নির্ব্বাচিত একজন বর্গনায়ক থাকে। বিদ্যাথারা বর্গে ঢোকার আগে এর কাজ হচ্ছে প্রত্যেকের পরিচ্ছন্নতা খুঁটিয়ে দেখা। কোন একটি অঙ্গ অপরিচ্ছন্ন থাকলে বিদ্যার্থীকে তৎক্ষণাৎ তা পরিষ্কার করে আসতে পাঠান হয়। পরিচ্ছন্ন না হয়ে বর্গে প্রবেশ নিষেধ। শিক্ষকও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাতায় প্রত্যেক বিদ্যার্থীর পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্ত্তিতার বিবরণ নিয়ে নেন। সুতরাং, মাসের শেষে বা প্রয়োজন হলে অন্য যে-কোন সময়ে, আন্দাজের ওপর নির্ভর না করে, বিদ্যার্থীর পরিচ্ছন্নতা বা সময়ানুবর্ত্তিতা সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয়। কোন বিদ্যার্থী স্বভাবতঃ কোন একটা বিশেষ অঙ্গের পরিচ্ছন্নতার প্রতি অমনোযোগী কিনা, শিশুর অগ্রগতি ব্যাহত কিংবা এলোমেলো কিনা এও তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারেন এবং প্রত্যেক শিশু ও তার অভিভাবকদের যথাযোগ্য উপদেশ দিতে পারেন। অন্যদিকে বর্গে কোন্ বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন, তা তিনি সহজেই খুঁজে পান। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত এবং হেড মাষ্টার কতৃ ক বহুবিধ কারণে নির্ব্বাচিত বই শিক্ষকের ঘাড়ে চাপিয়ে

দেওয়া হয় না এবং তার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়ান শিক্ষকের কাজ নয়। তাই বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের এই সুবিধার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই হাজিরা বইএ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে ১৫।২০ মিনিট লেগে যায় বটে কিন্তু এই সময়টুকুর যথার্থ সদ্ব্যবহার হয় বলেই আমরা মনে করি। শিশুরাও এই সময়ের মধ্যে পরিচ্ছন্ন হয়ে বর্গে তার স্থান গ্রহণ করতে পারে।

এই পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় স্বাবলম্বন ও সরঞ্জামের দিকে। বিদ্যার্থীদের যে কেবলমাত্র পরিচ্ছন্নতা ও তার ফলাফল সম্পর্কেই জ্ঞান দেওয়া হয় তা নয়, পরন্তু পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য যে সব জিনিষপত্র দরকার তা কেমন করে সহজেই সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করা চলে তাও শিখিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র বিদ্যার্থীদের নয় শিক্ষকদেরও অজস্র শিখবার মত জিনিষ রয়েছে। আমাদের চারপাশের গাছপালা, মাটি সবই আমাদের অপরিচিত; এরা যে আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিদেশী ছাপ নিয়ে দেশী গাছপালার নির্য্যাস যখন সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে পচা বাসি হয়ে আমাদের কাছে আসে তখন আমরা সানন্দে সাগ্রহে উচ্চমূল্যে তা কিনে থাকি অথচ আমাদের চারপাশে সেই মূল্যবান জিনিষগুলি পড়ে থাকে অবজ্ঞাত হয়ে। আমরা নিম টুথপেষ্ট ব্রুশ দিয়ে ঘসে দাঁত মাজি অথচ নিমের দাঁতন, স্যাওড়ার দাঁতন, বাবলার দাঁতন ব্যবহার করিনে। ব্যবহার যদি বা করি তবে করি নেহাৎ যান্ত্রিক অনুকরণে, তাদের মূল্য জানিনে। তামা-পিতলের জিভ ছোলা ব্যবহার করি অথচ দাঁতন চিরে জিভ পরিষ্কার করতে জানিনে। এই রকমের ঝাঁটা দিয়ে সব কিছু সাফ করতে গিয়ে সময় ও শক্তি উভয়ের অপব্যবহার করি অথচ সহজেই

যে বিভিন্ন কাজের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন রকমের ঝাঁটা তৈরী করা চলে তা একটু ভেবেও দেখিনে। তেমনি কাপড় ধোয়ার কাজে আমরা বাজার থেকে সাবান আর সোডা কিনে আনতেই অভ্যস্ত; কোন কারণে এই সামগ্রী দু'টির কমতি পড়লে আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। অথচ আমাদের চারপাশে অনেক জায়গায় সাজিমাটি রয়েছে তা আমরা চিনিনে, আশেপাশে রীঠা গাছ, যথেষ্ট পরিমাণে খারযুক্ত গাছপাতা রয়েছে যা আমরা ব্যবহার করিনে বা করতে জানিনে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই গ্রাম্য সামগ্রীগুলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়। এই সকল সামগ্রী বিদ্যার্থীরা নিজেরাই সংগ্রহ করে এবং ব্যবহার করতে শেখে। সঙ্গে সঙ্গে এর পেছনে যে বিজ্ঞান রয়েছে তার সঙ্গেও বিদ্যার্থীদের পরিচয় ঘটে এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিশু নিবিড় যোগে আসে, এতে যে বিজ্ঞান শিক্ষা অনেক বেশী হয় এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হয়, তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই।

ব্যক্তিগত সাফাইর আর একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে প্রক্রিয়ার সাফাই। এই কথাটা বোধহয় একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। পরিচ্ছন্নতার মনোবৃত্তি যার তৈরী হয়েছে তার প্রত্যেক কাজে সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচি ফুটে ওঠে। পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা যেখানে কেতাবী, সেখানে এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ জন্মায় না। এ সম্পর্কে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর বক্তব্য খানিকটা উদ্ধৃত করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার 'শিল্প-কথা' নামক পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন:

"আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাদান হয়, কলা-চর্চ্চার স্থান ও মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিক দিয়ে এ পর্য্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা

মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। এর কারণ আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, শিল্পচর্চ্চা একদল পেশাদার শিল্পীরই একচেটিয়া কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। শিল্প না বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগৌরব বোধ করেন না—আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তারা ফটো ও ছবির তফাৎ বোঝে না। জাপানী খেলো পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করে অবাক হয়ে থাকে; বিশ্রী রঙ করা লাল নীল বেগুনী জার্ম্মান র‍্যাপার দেখতে চোখের পীড়া বোধ তো করেই না, বরঞ্চ উপভোগ করেই থাকে; সহজপ্রাপ্য, সস্তা মাটির কলসীর বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে টিনের ক্যানাস্ত্রা ব্যবহার করে। এর জন্য দায়ী দেশের শিক্ষিত সমাজ, প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়। আপাতঃদৃষ্টিতে বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, রসবোধের দৈন্যও তেমনি ক্রমশঃ পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। প্রতিকারের উপায়—তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে কলাশিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা; কারণ, এই শিক্ষিত সমাজই জনসাধারণের আদর্শ স্বরূপ।

"সৌন্দর্য্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাবে যারা বাড়ীর উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড় করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথেঘাটে রেলগাড়ীতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয়, তেমনি তাঁদের কুৎসিৎ আচরণের কু আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

"আমাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা কলাচর্চ্চায় বিলাসী ও ধনী

ব্যক্তিরই একমাত্র অধিকার বলে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে নির্ব্বাসিত করে রাখতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সুষমাই শিল্পের প্রাণ, অর্থ-মূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার চলে না। গরীব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার কলেজে পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোষ্টেলের বা মেসের ঘরে দামি কাপড়-জামা, তৈজসপত্র এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে জবড়জঙ্গ করে রাখে। এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্য্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, ধনী সন্তানের সৌন্দর্য্যবোধ পোষাকী ও প্রাণহীন। শিল্প উপাসনার নামে ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেম-বাঁধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভাল ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই। ছাত্র মহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে—পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আর্শি, চিরুণি ও কোকোর টিনে কাগজের ফল সাজান। প্রসাধনের কাপড়ের উপর বুকখোলা কোট, সাড়ীর সঙ্গে মেমসাহেবী খুরওয়ালা জুতো—এরূপ সর্ব্বত্রই সুষমার অভাব—আমাদের বিত্ত থাক আর না থাক, সৌন্দর্য্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।

আবার একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন—"আর্ট করে কী পেট ভরবে?" এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চ্চার দু'টো দিক আছে, একটা আনন্দ দেয়, আর একটা অর্থ দেয়। এই দু'টি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্পের চর্চ্চা। চারুশিল্প আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিষগুলিতে সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক দুর্গতি আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনের ক্ষেত্র

থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির পক্ষে অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে কারু। একে আমরা কারুশিল্প বল্‌তে পারি। এখানে রুচিবোধ যেমন আনন্দের দ্বার খুলে দেয়, তেমনি কাজের সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ বাড়িয়ে তার মূল্যকেও বাড়িয়ে তোলে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্যটা হয়ত' আরো পরিষ্কার হবে। প্রথমতঃ সাফাইর কথাই ধরা যাক্। পরিচ্ছন্নতার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই স্বীকার করি। শোষণহীন সমাজ গড়তে হলে এই কাজটা একটা বিশেষ শ্রেণীর লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অসমীচীন, এও হয়ত অনেকেই স্বীকার করবে; কিন্তু একজন মেথরের সাফাইর কাজ করার ও একজন বিদ্যার্থীর এই কাজ করার তফাৎ কোথায়! মেথরের কাজটা তার জীবিকা উপার্জ্জনের একটা পন্থা মাত্র, বিদ্যার্থীর কাজটা একটা শিল্প। কত সুন্দরভাবে বিদ্যার্থী তার এই কাজটি করতে পারে তার উপরেই বিদ্যার্থীর শিল্প-শিক্ষার উৎকর্ষ নির্ভর করে। একদিকে ঘর পরিষ্কার করা বলতে বিদ্যার্থী যেমন কেবলমাত্র ঘরটা ঝাঁট দিয়ে আসবাবপত্র ঝেড়ে মুছে রাখা বুঝে না, পরন্তু ঘরটিকে গুছিয়ে, বিবিধ জিনিষপত্র যথোপযুক্ত স্থানে রেখে, সকল দিকে সকল প্রকার সুসামঞ্জস্য বিধান করে আলপনা, চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে ঘরটিকে সুন্দর করে তুলে আনন্দের একটা দ্বার খুলে দেয়; অন্য দিকে তেমনি প্রক্রিয়ার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে সে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের দিকে মন দেয়, এ্যাপ্রণ, নাকুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কাজকে সহজতর করে তোলার ব্যবস্থা করে, সঙ্গে সঙ্গে নিপুণতা বেড়ে যায় বলে কম সময়ে অধিক কাজ সম্ভব হয়।

এভাবে সূতা কাটার কাজ ধরা যাক্। প্রথমাবধি প্রত্যেকটি

প্রক্রিয়া পরিচ্ছন্নভাবে না করলে ফলস্বরূপ যে সূতা বা কাপড়টা আমাদের কাছে আসবে সেটা যেমন চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়, তেমন গুণের দিক থেকেও তা হয় অকিঞ্চিৎকর, অতএব মূল্যের দিক থেকেও তার ওজন থাকে কমই। কার্পাস গাছ থেকে তোলার সময় উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে পরিচ্ছন্ন তুলা চয়ন না করলে যেমন একে পরে পরিচ্ছন্ন করতে অনেক সময়ের অযথা অপব্যয় হয়, তেমনি শুকনো পাতা ইত্যাদি পোলের মধ্যে থাকায় বারে বারে সূতা ছিঁড়ে তুলার অপচয় ঘটে, সময়ের অপব্যবহার হয় এবং সূতাও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজীবী হয়। আবার তুলা ধোনার সময় যন্ত্রপাতি, হাত পরিষ্কার না রাখলে, পরিচ্ছন্ন স্থানের উপর ধোনাইর কাজ না করলে সেই ধোনা তুলা দিয়ে শক্তিশালী সূতা প্রস্তুত হতে পারে না, তেমনি সূতা কাটার সময় অপরিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে, অতিরিক্ত ছাই ইত্যাদি ব্যবহার করলে একদিকে যেমন ময়লা সূতা বের হয়, তেমনি অন্যদিকে সে সূতার কাপড় টিঁকে কম বলে ক্ষতির কারণ হয়।

প্রথমতঃ শিশু বিদ্যালয়ে এলেই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা দেখা হয়। তারপর তারা প্রার্থনা করে বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করে। প্রার্থনার সময় সোজা হয়ে বসা, আসন সোজা করে পাতা, প্রত্যেকটি পংক্তি সোজা করে এবং সমান দূরত্ব রেখে আসন সাজান, প্রত্যেকের পাশে নিজের ব্যবহারের জিনিষপত্র সুন্দর করে স্বল্পপরিসরের মধ্যে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তারপর যেখানে সম্ভব প্রাতর্ভোজন হয়। প্রাতর্ভোজনের আগে হাত-পা ধোয়া, খাবার পাত্র ভাল করে ধোয়া, ধুতে যাবার সময় শ্রেণীবদ্ধভাবে একের পর এক শৃঙ্খলার সঙ্গে যাওয়া, পরিবেশনকারী ও পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতা, সকলে শান্তভাবে সমান ভাগ করে খাওয়া, খাওয়ার পর আবার বাসন-

পত্র ও মুখ ধোয়া, খাওয়ার স্থান পরিষ্কার করা প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়।

এভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতি কাজে সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজকে শিল্প করে তোলে। বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের চেহারা কিভাবে বদলে যায়, এখানেই হলো তার রহস্য। কাজ আর বোঝামাত্র থাকে না, হয়ে যায় শিল্প স্থষ্টি। শিল্পী যেমন তার স্থষ্টিকে বোঝামাত্র মনে করে না, তন্ময় হয়ে ডুবে যায় স্থষ্টির কাজে, শিল্পের প্রেরণা যেমন তাকে আনন্দরসে পুষ্ট করে কর্ম্মচঞ্চল করে রাখে প্রতিনিয়ত; তেমনি বিদ্যার্থীও মগ্ন হয়ে যায় তার কাজের মধ্যে; কারণ, তার পেছনে থাকে জ্ঞানলাভের আর নূতন স্থষ্টির আনন্দের প্রেরণা। প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে এমনি করে চলতে থাকে জীবন্ত শিল্প রচনার কাজ। যে শিক্ষক এই স্থষ্টির প্রেরণা, সৌন্দর্য্য রচনায় আনন্দের প্রেরণা জোটাতে পারেন না, তিনি কৃতকার্য্যতা লাভ করতে অসমর্থ হন; কারণ, সেক্ষেত্রে যান্ত্রিক কাজ বিদ্যার্থীর কাছে অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠে।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যেমন এভাবে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা হয়, তেমনি সামুদায়িক সাফাইর মনোভাব বিকশিত করাও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি প্রধান লক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়। স্বার্থ-সংকীর্ণ মনোভাব তৈরী করা আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ। মানুষের মধ্যে দু'টি প্রবৃত্তি প্রথমাবধি রয়েছে, একটি হচ্ছে সম্পত্তি-বোধ অন্যটি সমাজ-বোধ। আদিমকাল থেকে আমরা দেখতে পাই একদিকে মানুষ নিজের জন্য সঞ্চয় করছে, ব্যক্তিগত অভিলাষ পূরণের জন্য অন্যের কাছ থেকে লোভনীয় সামগ্রী ছিনিয়ে নিতেও দ্বিধা বোধ করছে না; অন্যদিকে সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য এক সঙ্গে ঘর বেঁধেছে, সমাজ গড়েছে। মানুষের সমষ্টিগত জীবন গড়বার প্রয়াস যে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে তা মনে করার কোন

কারণ নেই; কেবল যে দায়ে পড়েই মানুষ অন্যের সঙ্গ কামনা করে তা নয়।

মানুষের ভেতরে একটা প্রকৃতি রয়েছে পরের সঙ্গ লাভের। সমষ্টিগত জীবনে মানুষ আনন্দ লাভ করে, পরের মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেতে চায় বলেই নিজেকে বিলিয়ে দিতেও অনেক সময় দ্বিধা বোধ করে না। নিজের দেহগত জীবনে মানুষ তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। তাই পারিবারিক জীবনে সমষ্টিগত আনন্দের মধ্যে সে আত্মতুষ্টির সোনার কাঠিটির সন্ধান করে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা খানিকটা ত্যাগ করেও সে সমাজের মধ্যে স্থান পেতে চায়।

মানুষের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ তার সম্পত্তি-বোধের বিবর্ত্তন ঘটিয়েছে তার অক্লান্ত সাধনার দ্বারা। সম্পদ লাভের সাধনায় মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে, নূতন নূতন চাহিদা তৈরী করেছে এবং নূতন নূতন সৃষ্টি দ্বারা সে চাহিদাকে পূর্ণ করেছে। আজ যে সম্পদ পেয়েও মানুষ তুষ্টি লাভ করতে না পারছে সেদিনও সে সম্পদ মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। এক শতাব্দী আগেও যে সম্পদ লাভ করলে মানুষ আর কিছু কাম্য বলে কল্পনাও করতে পারত না, আজ আর সে তাই পেয়ে তুষ্ট হয় না—তার কল্পনা আরো সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তাই তার কামনাও হয়ে উঠেছে আরো ব্যাপক।

কিন্তু যে সাধনা মানুষ করেছে তার সম্পদ-বোধকে পরিতৃপ্ত করার জন্য তার অণুমাত্রও করেনি সমাজ-বোধকে উন্নত করার জন্য। মানুষ বস্তুজগতের চেহারায় বিরাট পরিবর্ত্তন আনয়ন করেছে—ভোগের বস্তুকে সৃষ্টি এবং আয়ত্তাধীন করার জন্য, কিন্তু মানুষের মনের পরিবর্ত্তন সামান্যই হয়েছে। তাই যখন হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি মন থেকে বিদূরিত করে নূতন মন, নূতন সমাজ গড়ে তোলার প্রশ্ন উঠে, তখন উত্তর আসে

যে—ঐগুলি আমাদের মনের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের আদিম মন চিরকাল বর্ব্বর থেকে যাবে—একেই আমরা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছি, এর অস্বাভাবিকত্ব আমাদের চোখেই পড়ে না। বস্তুজগতে বিবর্ত্তন যদি সম্ভব হয় তবে মনোজগতেও সেই বিবর্ত্তন সম্ভব, কেবলমাত্র আমরা ভুলপথ অবলম্বন করেছি বলে, বস্তুজগতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার কাজে আমাদের সকল শক্তিকে সংহত করেছি বলেই আমাদের মনোজগতে কোন বিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় নি। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনার ফলে অজস্র শক্তি সঞ্চয় করলেও সে শক্তিকে হীনবুদ্ধি পশুর মত আত্মঘাতী নরমেধ-যজ্ঞে প্রয়োগ করছি। মনের এই বিবর্ত্তন যে সম্ভব তার উদাহরণ আমরা যুগে যুগে পেয়েছি মহামানবদের জীবনে—যাঁরা কাম-কামনা-দগ্ধ জগতকে সংযম ও আত্মত্যাগের নির্ম্মল আলোকে স্নিগ্ধ করে গেছেন, যাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির উর্দ্ধে উঠে মানুষকে ডাক দিয়ে গেছেন আর সেই ডাকে মানুষের প্রাণে প্রাণে নূতন সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। সত্য বটে সেই আদর্শকে মানুষ দীর্ঘকাল অবলম্বন করে থাকতে পারে নি, সত্য বটে যুগ-যুগান্তরের সেই সকল মহাবাণীকে মানুষ তার স্বার্থ-পরতায় বিকৃত করেছে। তবু যে মানুষের প্রাণ ঐ ডাকে সাড়া দিয়েছে—স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা, কদর্য্য স্বেচ্ছাচারিতা, মূঢ় অহমিকা, আত্মঘাতী অত্যাচার লজ্জায় মাথা নীচু করেছে ক্ষণিকের জন্মও, ষড়যন্ত্র অবলম্বন করেছে সুড়ঙ্গ পথ—সাহস পায়নি প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে বিচরণ করতে, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, মানুষের আত্মার শাশ্বত যোগ রয়েছে সত্যের সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, নির্ম্মল প্রেম ও আনন্দের সঙ্গে। মাতৃগর্ভে যখন প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়, তখন সে থাকে একটি বিন্দুমাত্র, ধীরে ধীরে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে চলে তার বিকাশ, একটি কোষ পরিণত হয় কোটি কোটি বিভিন্ন ধর্ম্মী বিভিন্ন আকৃতির কোষে, প্রারম্ভের একটি

কোষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনের বেলায়, বিশেষ করে মানসিক ব্যাপ্তির বেলায়, এ সত্যটুকুকে আমরা সর্ব্বদা উপেক্ষা করি। আত্মকেন্দ্রীয় স্বার্থ সীমাবদ্ধ, প্রয়োজনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে পরিসমাপ্ত যে মন মানুষের আবির্ভাবের প্রথম পর্য্যায়ে ছিল, আজ সমাজের পূর্ণতর অবস্থায়, মানব-সমাজের বিস্তৃততর যোগাযোগে যে তার রূপান্তরের অনিবার্য্য প্রয়োজন এসেছে, তা যেন বুঝেও বুঝি না। আমরা ধরে নিয়েছি, মনের বিকাশ মানে বুদ্ধির বিকাশ, আত্ম-কেন্দ্রিক মনকে আরো শক্তিশালী করে তুল্লেই যেন আমরা আমাদের চরম লক্ষ্যে এসে পৌঁছে যাব। এ যে কেবল আত্মবঞ্চনা তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মনকে প্রসারিত করা আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিরাট পৃথিবী আজ ছোট হয়ে এসেছে রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, বেতার প্রভৃতির কল্যাণে; শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপক ও জটিলতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রয়োজন বেড়ে গেছে শত গুণে; মানুষের মূঢ় আত্মকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস ও সহযোগিতা ব্যাপকতর হচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মূল সত্যটিকে স্বীকার করে সমাজের নূতন রূপায়নের কথা ভাবা হয়। পরিচ্ছন্ন আমরা সকলেই থাকতে চাই; কিন্তু সে পরিচ্ছন্নতা নিজের হাতে সৃষ্টি করতেই আমাদের যত আপত্তি। পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করার কাজকে আমরা হেয় বলে ভেবে রেখেছি এবং এ কাজের ভার দিয়ে রেখেছি নাপিত, মেথর, ধোপা প্রভৃতির হাতে। এরা শিল্পী নয়—এরা সমাজের সবচেয়ে অবজ্ঞাত, অস্পৃশ্য, শিক্ষাহীন লোক। ফলে পরিচ্ছন্নতার মূল কাজগুলির উন্নতি-বিধান সম্ভব হচ্ছে না। নাপিত একশ বছর আগেও যেভাবে কামানোর কাজ করত, আজও সেইভাবেই কামায়, মেথর যুগ-যুগান্তর ধরে একই

ভাবে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করার কাজ করছে। এজন্য আমাদের দেশে এ সব কাজের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ একশ্রেণীর লোকের ওপর একাজ যন্ত্রবৎ করার ভার চাপিয়ে আমরা সমাজের এই বিরাট অংশকে পঙ্গু করে রেখেছি; এদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে তাদের সম্ভাব্য দানের দ্বারা সমাজকে উন্নত করার পথে কাঁটা দিয়েছি। এ কাজ সবাই ভাগ করে নিয়ে প্রক্রিয়াগুলির উন্নতি সাধন করা এবং সকলকে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে সমাজকে সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত করে তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম আদর্শ।

অপরিচ্ছন্নতা-প্রসূত কদর্য্যতা ও ব্যাধি আজকাল গ্রাম্যজীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অপরিচ্ছন্নতার এই ফল ভোগ করতে হয় সকলকেই, আর এই অপরিচ্ছতার জন্য দায়ীও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সকলেই। ২৪ পরগণা জেলার সাধনাশ্রম বলে যে স্থানটিতে আমার বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্র তার পাশেই "বিহারী" বলে ছোট্ট একটি গ্রাম আছে। এই এলাকাটি এখনও পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত রয়েছে বলা চলে, অন্ততঃ ম্যালেরিয়া এখানে মহামারীরূপে ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করছে না। কিন্তু এ গ্রামে সেদিন একটি বেশ বড় পুকুর দেখে এসেছি। গ্রামের লোকেরাই বলেন যে, পুকুরটি মাছের চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত। কিন্তু পুকুরটির সরিক-সংখ্যা এখন বাড়তে বাড়তে জন পনেরতে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং, ভাগের মা আর গঙ্গা পাচ্ছেন না—পুকুরটির পাড়ে পাড়ে ঝোপ-ঝাড়ের অন্ত নেই, পানা আর জলজ ঘাসে পুকুরের জল দেখা যাচ্ছে না। মশা যে নির্ব্বিবাদে বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে তার প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবেই পেলাম কামড়ের পর কামড় খেয়ে। যে বাড়ীগুলির সামনে পুকুরটি রয়েছে সে সব বাড়ীর লোকেরা পুকুরের মালিক নন; সুতরাং, পুকুরটির সংস্কার করার কোন দায়িত্ব তাঁদের আছে

বলে তাঁরা মনে করেন না। অতএব পুকুরটি নির্ব্বিবাদে বিপজ্জনক হবার সুযোগ পাচ্ছে, সমগ্র গ্রামের শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন মশার আক্রমণে ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে, গ্রামের অধিবাসীরা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন, আর মালিকরা পারস্পরিক অধিকারের দাবী নিয়ে লড়াই করছেন। এরকম ভাবেই গ্রামের সার্ব্বজনীন বিপদের মেঘগুলি একপ্রান্তে জড় হয়; তারপর অকস্মাৎ ধারা নেমে আসে সমগ্র গ্রাম-জীবনকে পর্য্যুদস্ত করে দেবার জন্য। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, গ্রামবাসীদের সামুদায়িক কাজে নিজ নিজ দায়িত্ববোধের অভাব। প্রথম থেকেই আমাদের সমাজে 'চাচা আপনা বাঁচার' শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নিয়ে মত্ত হয়ে থাকতেই আমরা শিখি; কিন্তু সার্ব্ব-জনীন কাজগুলিতে যথোপযুক্ত অংশ না নেওয়ার ফলে কিভাবে আমাদের ক্ষতি হয় তা ভাবতে শিখি না; ফলে আমাদের সামনে দিয়ে মাছিটি যেতে দি না, কিন্তু পেছন দিয়ে হাতীও চলে যায়। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' কথাটা শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং একেই পরম সত্য বলে মানতে শিখেছি; কিন্তু সমষ্টির নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগ এবং প্রগতির উপরেই যে ব্যক্তিগত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে, এ কথাটা আমরা ভাবতে ভুলে গেছি।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সমাজ-জীবনে ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রথমাবধি দেওয়া হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কাজকে সমান সম্মানজনক বলে মনে করার শিক্ষাও শিশুরা পায়। নিজের পরিচ্ছন্নতার বিধান প্রত্যেকের নিজেরই করা উচিত, নিজে নিজে করতে পারাই আদর্শ এবং সেটাই সম্মাজনক, না করতে পারা অক্ষমতার পরিচায়ক এবং সেটাই অসম্মানজনক—এই শিক্ষাই শিশু

এখানে লাভ করে। প্রথমেই শিশুরা বিদ্যালয়ের জীবনের কতকগুলি দায়িত্ব গ্রহণ করে—যেমন নিজেদের বর্গ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব, নিজেদের বর্গের জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখার ও যথোপযুক্তরূপে রাখার দায়িত্ব, বর্গের শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব, পানীয় জলের সুব্যবস্থার দায়িত্ব ইত্যাদি। এই সকল দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই শিশু প্রথম সংগঠিত সমাজ-জীবন যাপনের এবং সমাজ-সেবার শিক্ষা পায়। এই শিক্ষার ফলে শিশু উত্তরকালে সমাজের অমঙ্গলজনক কোন কিছুর প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না এবং এই অমঙ্গলের কারণকে দূরীভূত করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতার কাজ সুরু হয় নিজেদের বর্গের পরিচ্ছন্নতার বিধান নিয়ে। বর্গের প্রত্যেকটি সরঞ্জাম যাতে পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে রাখা হয় সেদিকে শিক্ষক প্রথমাবধি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ এক এক রকমের জিনিষ গুছিয়ে রাখার জন্য ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বর্গের একজন নির্ব্বাচিত সচিব থাকে। বর্গের পরই আসে শিশুর নিজের বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা বিধানের দায়িত্ব। শিশুর শক্তি অনুযায়ী বাড়ীর একটা বিশেষ অংশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শিশুকে দেওয়া হয় এবং শিক্ষক নিয়মিতভাবে বাড়ী গিয়ে বিদ্যার্থীর কাজের প্রগতি দেখে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও গ্রহণ করেন। এভাবে শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু কঠিনতর কাজের ভার নেয় এবং ক্রমে সমগ্র গ্রামকে পরিষ্কার করার ও গ্রাম সাফাইর সংগঠন কাজ বিদ্যার্থীরা নিজেরাই গ্রহণ করে। কোন একটি কাজ গ্রহণ করার আগে প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হয় এবং কাজ করার সাথে সাথে সে কাজের কৌশল, সরঞ্জামের যন্ত্রশাস্ত্র এবং সংগঠনের কৌশল ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করে। পূর্ব্ব বুনিয়াদীবর্গের শিশুরাও যে ঐ কাজে কতখানি অংশ

গ্রহণ করতে পারে, তা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। সেগাঁও মহারাষ্ট্রের একটি সাধারণ গ্রাম। গ্রাম থেকে অনতিদূরে মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম আশ্রম। সুতরাং, এটা স্বাভাবিক যে, গান্ধীজী তাঁর আদর্শ অনুযায়ী এই গ্রামটিকে গড়ে তুলতে যত্নশীল হবেন। তাঁর ধারণা এই যে, যদি একটি গ্রামে তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়, তবে ভারতের সর্ব্বত্রই তা সার্থক করা সম্ভব হবে। পরিচ্ছন্নতাকে গান্ধীজী গঠনমূলক কাজে একটি প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন। সেই অনুসারে, সেগাঁওকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার চেষ্টা সুরু হল। সেগাঁও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য গ্রামেরই মত ঘন বসতিপূর্ণ একটি অপরিচ্ছন্ন গ্রাম। পথে পথে আবর্জ্জনা, শিশুরা পাইখানা করে রাস্তা ভরিয়ে রাখে, এমন কি বড়রাও রাস্তার উপর পাইখানা করতে দ্বিধা করে না। আট বছর চেষ্টা চলল আশ্রমের অর্থে মেথর রেখে গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করার। কিন্তু ফল হল উল্টো। গ্রামবাসীরা ভাবল যে, গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আশ্রমের। ফলে আবর্জ্জনা তারা পথের উপরেই ফেলে রাখ্‌তে লাগল। ৮ বছরের চেষ্টায় হাজার তিনেক টাকা খরচ করেও এ বিষয়ে কিছু উন্নতি দেখা গেল না। সেগাঁও-এ যখন ১৯৪৫ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ব-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হল তখন বুনিয়াদী শিক্ষার রীতি অনুযায়ী শিক্ষক শিশুদের নিয়ে রোজ গ্রামের সঙ্গে পরিচয় ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য গ্রামে বেড়াতে বেরুতেন। শিক্ষক শিশুদের নিয়ে পথে চলার সময় পথ পরিষ্কার করে চলতেন, স্বাভাবিকভাবে শিশুরাও যোগ দিত, যেখানে তারা নিজেরা পারত না সেখানে মা বাপকে টেনেটুনে এনে এই পরিচ্ছন্নতার কাজে লাগাতে কসুর করত না। ফলে ছয় মাসের মধ্যে শিশুরা রাস্তাকে অপরিচ্ছন্ন করাকে অন্যায় বলে জানতে শিখল, বড়রা রাস্তা অপরিষ্কার করাকে লজ্জাকর অন্ততঃ, অসুবিধাজনক বলে বুঝতে শিখল।

ফলে দেখেছি যে, শিশুরা যখন অপরিষ্কার রাস্তার পাশে বসে খেলা করত তখন যদি সেগাঁওয়ের সেবাকাজের পরিচালিকা শান্তাদেবীকে তারা দেখত তবে সবাই সলজ্জভাবে বলে উঠত "শান্তাবাই, ও অপরিষ্কার আমি করিনি"। বড়দের জন্য, বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য যেখানে দীর্ঘকাল পাইখানা তৈরী করে দিয়ে কোন ফল হয়নি, সেখানে তারা ধীরে ধীরে পাইখানা ব্যবহার করতে শিখেছে। এ ভাবে এ শিক্ষার মধ্য দিয়ে কেবল যে শিশুদেরই পরিচ্ছন্নতার ও সমাজ-সেবার শিক্ষা হয়, তা নয় ; এ শিক্ষা বয়স্ক-শিক্ষারও একটি সহযোগী ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

এ-থেকেই বোঝা যাবে যে, নিজ নিজ পরিচ্ছন্নতা বিধান ও সামুদায়িক সাফাইর কাজকে বুনিয়াদী শিক্ষায় কত বড় স্থান দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ৭ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য যে কার্য্যসূচী তৈরী করা হয়েছে, তাতে সাফাইকেই দেওয়া হয়েছে প্রথম স্থান।

শিশুর স্বাস্থ্য—বিশ্রাম ও পরিশ্রম

বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সামগ্রিক বিকাশ। এই সামগ্রিক বিকাশের ভিত্তি হচ্ছে শিশুর দেহ। দেহকে গড়ে তোলার জন্য যেমন প্রয়োজন অন্নবস্ত্র ও পরিচ্ছন্নতার, তেমনি প্রয়োজন বিশ্রাম ও পরিশ্রমের সুসংযত ছন্দের। খাদ্য আমাদের দেহকে গড়ে তোলার মালমশলা যোগায় মাত্র; তাকে শরীর গড়বার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হলে সুপ্রচুর পরিশ্রম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা ফেলে রাখলেই হয় না, তাকে খাটাতে হয় লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্য, তেমনি দেহেও কতকখানি খাদ্য প্রবেশ করিয়ে দিলেই হয় না; তা দিয়ে শরীরকে লাভবান করতে হলে শরীরকে উদ্যোগী হতে হয়। আমাদের শরীরটা যন্ত্রের মত; অব্যবহারে তাতে মরচে পড়ে, সাধ্যাতিরিক্ত জোরে চালালে তা ভেঙ্গে পড়ে, অতিরিক্ত বাষ্প ভিতরে জমতে দিলে তা ফেটে যায়, আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিয়ে আবর্জ্জনাশূন্য ও তৈলনিষিক্ত না করলে শীঘ্র ক্ষয় পায়।

কি করে খাদ্য আমাদের দৈহিক পুষ্টির কাজ করে সে সম্পর্কে আমাদের প্রথমে ভাল করে বোঝা দরকার। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার খানিকটা হজম হয়ে খাদ্যসারে পরিণত হয় এবং দেহ কর্তৃক শোষিত হয়। বাকী অংশটা মলরূপে বেরিয়ে যায়। সুতরাং, হজম করার শক্তি যেখানে কম সেখানে বেশী করে খাওয়া মানে নিছক অপচয়। খাদ্যের শরীরের কাজে লাগাটা নির্ভর করে হজমের যন্ত্রপাতির সক্রিয়তা ও পাচকরসের যথোপযুক্ত নিষ্ক্রমণের উপর। শরীরের যন্ত্রগুলির ভিতরে অজ্ঞাতভাবে ক্রিয়াশীল মাংসপেশী অনেক আছে। এদের ক্রিয়া

চলছে প্রতিনিয়ত—জন্মমুহূর্ত্ত থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রায়-জাগরণে এদের কাজ চলছে। এদের কাজ চালাবার জন্য পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সারাদিনে ২৪০০ ক্যালরী উত্তাপ যোগাতে পারে এমন খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এটুকু খাদ্য না পেলে নেহাত অলস মানুষেরও শরীর ভেঙ্গে পড়বে ; কারণ, দেহের মালমশলা পুড়িয়েই শরীর তখন বাধ্য হয়ে এই উত্তাপটুকু সংগ্রহ করে নেবে। প্রতি ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করতে উত্তাপ প্রয়োজন হয় সাধারণ উত্তাপের চার-পাঁচ গুণ। কিন্তু দেহের খাদ্যখরচের মধ্যে একটা মজা আছে। সাধারণতঃ খরচ করা মানে নিঃশেষে শেষ করে ফেলা, কিন্তু দৈহিক-পরিশ্রমের দ্বারা যে খরচ হয় তাতে শরীরের অবনতি না হয়ে উন্নতিই হয়। আমাদের দেহে ২৪৫টি ঐচ্ছিক মাংসপেশী আছে। অঙ্গ-চালনায় এই পেশীগুলি বারবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। আমরা যে সব খাদ্য খাই তা রক্তের সঙ্গে মিশে সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু রক্তে সঞ্চিত খাদ্যসার পেশীর কোন কাজে লাগে না যতক্ষণ না অঙ্গ পরিচালনার ফলে পেশী সঙ্কুচিত হয়। এজন্য খাওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রম না করলে প্রয়োজনীয় খাদ্য পেশীর মধ্যে ঢুকতে পারে না, খাদ্য দেহের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এরা হয়ে থাকে বুভুক্ষ, অপুষ্ট। অঙ্গ পরিচালনার ফলে একটি মাংসপেশী সঙ্কুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে ফাঁক পেয়ে খানিকটা তাজা রক্ত ঢুকে যায়, আর সেই সুযোগে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত খানিকটা তরল খাদ্যসার আর খানিকটা অম্লজান বাষ্প তার অণুতে অণুতে গিয়ে প্রবেশ করে। আবার যখন সেই পেশী প্রসারিত হয়, তখন তার মধ্যকার সমস্ত দূষিত কার্বনিক এ্যাসিড বাষ্প ও অন্যান্য ক্লেদবস্তুগুলি বেরিয়ে গিয়ে পেশীর ভেতরকে নির্বিষ করে দেয়। এভাবে পরিশ্রম যতটা হয় ততই বারবার পেশী খাদ্যগ্রহণের সুযোগ পায়, আর তাতেই পুষ্ট, সুডৌল, দৃঢ় হয়ে উঠে। অবশ্য পরিশ্রম থেকে পুষ্টি পেতে হলে দেহের

খাদ্যভাণ্ডারে জমার পরিমাণটাও পর্য্যাপ্ত হওয়া চাই, নইলে ঘর ভেঙ্গে জ্বালানী সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে খাদ্য যথেষ্ট গ্রহণ করিলেও পরিশ্রম না করলে উপযুক্ত পুষ্টি হতে পারে না—হয় দেহ অজীর্ণ রোগে বিশীর্ণ হয়ে ওঠে, নয় মেদবহুল দেহ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

শরীরের পুষ্টির জন্য পরিশ্রমের চাইতে বিশ্রামের প্রয়োজন কোন অংশে কম নয়—'বিরাম কাজের অঙ্গ এক সাথে গাঁথা, নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।' জেগে আমরা যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ দেহকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব নয়। একই কাজ একসঙ্গে অনেকক্ষণ করলে একটা একঘেয়েমী আসে, তখন কাজ পরিবর্ত্তন করি ঃ কারণ, আমাদের মন বৈচিত্র্যের মধ্যে পায় প্রেরণা নূতন নূতন কাজের মধ্য দিয়ে নূতন আগ্রহের সৃষ্টি হয় ; এ ভাবে জাগ্রত অবস্থায় কাজ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে একটা অঙ্গ ও এক এক শ্রেণীর কোন সমষ্টিকে আমরা বিশ্রাম দিতে পারি। কিন্তু আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন আছে এবং শরীরকে এরকম বিশ্রাম দেওয়ার শুভক্ষণটি হচ্ছে ঘুমের সময়টা। ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য তাঁর 'পরমায়ু' নামক পুস্তকে এই প্রয়োজন সম্পর্কে ভারি সুন্দরভাবে লিখেছেন, তাঁরই লেখা থেকে নীচে খানিকটা উদ্ধৃত করলাম ঃ

...আমরা সকলেই জানি যে, মুখ দিয়ে যে সকল খাদ্য খাই, সেগুলো পেটে গিয়ে নানাবিধ উপায়ে হজম হ'তে হ'তে অবশেষে একটা তরল-সারে পরিণত হয়, তারপরে পেট থেকে সেই তরলসার রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই পর্য্যন্ত খুবই সহজ কথা। কিন্তু তারপরে খাদ্যসার সমগ্র দেহতন্তুগুলির পরতে পরতে প্রত্যেকটি কোষ মধ্যে গিয়ে পৌছান চাই, তবেই তার ক্রিয়া হতে পারে, নতুবা তার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এ কাজটি খুব সহজে সম্পন্ন হয় না। প্রতিদিন রক্তের মধ্যে খাদ্যসার জমা হয়ে প্রস্তুতই থাকে, শরীরস্থ

যাবতীয় কোষগুলিও সেই খাদ্য গ্রহণ করবার প্রত্যাশাতে উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ মানুষ জেগে আছে ততক্ষণ খাদ্য ও কোষের মধ্যে প্রকৃত যোগাযোগটি ঘটাবার উপায় নেই, কেবল ঘুমের শুভক্ষণটিতেই এই যোগাযোগ ঘটবে আর খাদ্যসারগুলি অনায়াসে সমস্ত কোষে কোষে পৌঁছে যাবে। অতএব খাদ্য যতই খাওয়া যাক, যতক্ষণ ঘুম না হচ্ছে ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই হলো না। অর্থাৎ যদি কেউ নিয়মিত খেয়ে যেতে থাকে আর একটুও না ঘুমিয়ে অনবরত জেগে থাকে, তাহলে সবকিছু খাওয়া সত্ত্বেও সে অভুক্তর মত অবস্থাতেই থেকে যাবে, আর দ্রুতগতিতে দুর্ব্বল হয়ে যেতে থাকবে।...শরীরের সকল অংশে খাদ্য বণ্টন করবার জন্য ঘুমই হচ্ছে একমাত্র শুভযোগ, আর প্রত্যহ আমাদের এই সুযোগটি মেলা দরকার।

বিশেষতঃ মস্তিষ্কের কাজের জন্য ঘুমের প্রয়োজন খুবই বেশী। জাগ্রত অবস্থায় শরীরের অন্যান্য সকল যন্ত্রই পালা করে একটু আধটু বিশ্রাম নেয় কিন্তু সজ্ঞান ও জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নেই। সুতরাং মস্তিষ্কের সচল ও সুস্থ পরিচালনার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক।

বিশ্রাম ও পরিশ্রমের সম্পর্কে এই কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রেখে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচী রচনা করা হয়ে থাকে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কেন্দ্র হচ্ছে শিশু—শিক্ষক নয়। এখানকার কর্ম্মসূচী শিশুর প্রয়োজন অনুসারে রচিত হয়—শিক্ষকের সুবিধা অনুযায়ী নয়। এখানে কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয়ের অবতারণা করা হবে তা শিশুর প্রয়োজনেই স্থিরীকৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইতিহাসের পর ভূগোল পড়ান হবে তারপর ইংরাজী—এরকম কোন নির্দ্দেশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীতে দেখতে পাওয়া

যাবে না। কলকাতা থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে হোটর মর্যাদা জাতীয় বিদ্যালয়ে এ সম্পর্কে একটি অভিনব পরীক্ষা চলছে। সেখানে বিদ্যার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার সময় স্থির করে দেওয়া নেই। তারা যখন খুশী বিদ্যালয়ে আসতে পারে। শুধু বিদ্যালয়ের কাজের হিসাবপত্র করবার সময় তারা একত্রিত হয় এবং যে সকল আলোচনা থাকে তা তারা করে নেয় সেই সময়েই। তবে এই স্বাধীনতার একটা সর্ত্ত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, বিদ্যালয়ে যেটুক তার করণীয় সেটা প্রত্যহ প্রত্যেক বিদ্যার্থীর করে দেওয়া চাই। এ পরীক্ষার সম্পূর্ণ ফলাফল বিবেচনার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু স্বল্পকালের পরীক্ষার ফলে এইটুকু দেখা গেছে যে, বিদ্যার্থীরা এতে অনেক বেশী আনন্দ পাচ্ছে, বিদ্যালয়ে তারা আগের চাইতে অনেক বেশী সময় কাটাচ্ছে এবং বিদ্যালয়গৃহ তাদের জীবনেরই একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যস্থচী রচনায় প্রথমে বিবেচনা করা হয়, শিশুর পক্ষে কোন্ কাজটা কখন করা প্রয়োজনীয় এবং কতক্ষণ করলে সে প্রয়োজন মিটবে। সেই অনুসারে কার্যক্রম স্থির করা হয়ে থাকে। তবে এই কার্যস্থচীও শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়ে দিয়ে শিশুকে দিয়ে করিয়ে নেন। শিক্ষক যে কার্যস্থচী রচনায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা গায়ের জোরে নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতর গুণের প্রভাবে। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: সাধারণতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আসার পর শিশুর প্রথম কাজ হয় শ্রেণীর ও আশপাশের পরিচ্ছন্নতা বিধান। কিন্তু বিদ্যালয়ে এসেই যে শিশু দেয়ালে টাঙানো কার্যস্থচীতে দেখতে পাবে—এতটা থেকে এতটা পর্য্যন্ত সাফারই কাজ—তা নয়। সাধারণতঃ এই সময় স্থির করা ব্যাপারটা শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে উভয়ের সম্মতি অনুসারেই ঘটে থাকে। অপরিচ্ছন্ন কাজের জায়গা নিয়েই হয়ত প্রথমে আলোচনা সুরু হয়। অপরিচ্ছন্ন স্থানে বসা উচিত নয়

এবং বসতে কারু ভাল লাগে না ; সুতরাং, পরিচ্ছন্ন স্থানে বসবার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই গৃহীত হয়। তখন গুরু-শিষ্য সকলে মিলে লেগে যান পরিচ্ছন্নতা বিধানে। এভাবে দু'চার দিন কাজ করার পর হয়ত ঠিক হয় যে, নোংরা জায়গায় বসা অথবা কাজ করা চলবে না ; সুতরাং, আমরা রোজ ভোরে এসে সর্ব্বপ্রথমে শ্রেণী ও আশপাশ পরিষ্কার করে ফেলব। প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক বিদ্যার্থীকে কার্যসূচী লঙ্ঘন করারও স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন ; কারণ, শিক্ষক জানেন, যে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে সেটা শিক্ষকের খেয়াল মত নয়, বিদ্যার্থীরই কাজের সুবিধার জন্য ; সুতরাং, নিয়মের ব্যতিক্রম করলে শিশুর কাজের অসুবিধা ঘটবে এবং শিশু সেটা অবিলম্বে এবং সহজেই বুঝতে পারবে। বুনিয়াদী শিক্ষক খুব ভাল করে এটা মনে রাখতে চেষ্টা করেন যে, যে শৃঙ্খলা বাইরের থেকে চাপান হয় তা হয় শৃঙ্খল। শৃঙ্খলা কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার কৌশল মাত্র ; সুতরাং, কাজ যে করবে তাকে অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া চাই। বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের ফলটা মুখ্য নয়, কাজটা কি ভাবে করা হয়, কাজের পরিচালনার সরঞ্জামাদি রচনা ও সংগ্রহ এবং বুদ্ধিযুক্তভাবে কাজটা করার মধ্যে বিদ্যার্থীর অংশ কতখানি আছে, অর্থাৎ শিশুর ব্যক্তিত্ব, বিচার ও কর্মশক্তির কতখানি বিকাশ হল, সেটাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। সুতরাং, ভুল করার স্বাধীনতাও শিশুর থাকা দরকার, যদি না সেই ভুল কোন সুদূরপ্রসারী বিপদের সম্ভাবনাকে ডেকে আনে। ভুল করার মধ্য দিয়েই শিশু অনেক সময় কাজের বিজ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে। যথা, প্রায় সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয়েই, বর্ষার দিন ছাড়া, ভোরের দিকে সূতাকাটার জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখা হয় ; কারণ, অন্য সময় সূতা ছেঁড়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু তবু যদি কোন শিশু অন্য সময় সূতা কাটতে চায় তবে তাকে সে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু দিন কয়েক পরেই শিশুর কাজের হিসাব করে ক্ষতিটা তাকে দেখিয়ে

দেওয়া হয়। ফলে শিশু স্বেচ্ছায় নিয়ম মেনে নিতে রাজী হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সুতা কাটার উপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্বন্ধে তার স্পষ্ট জ্ঞান জন্মে যায়।

দ্বিতীয়তঃ বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্যালয় বলতে চারটে দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ গৃহকোণটুকুকে বুঝায় না। শিশুর সমগ্র জীবন নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কারবার, বিদ্যালয়ে শিশু যে কয়েক ঘণ্টা থাকে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্যক্রম তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সমগ্র জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সমগ্র গ্রামখানি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিধি; সুতরাং ভোর থেকে আরম্ভ করে রাত্রে ঘুমনো পর্য্যন্ত শিশুর জাগ্রত ও সচেতন সময়টুকুর জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচী বিভিন্ন কাজ নির্দ্দিষ্ট করে দেবার চেষ্টা করে। সুতরাং, বুনিয়াদী শিক্ষককে কেবল শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর গৃহজীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা চালাতে হয়। সারাদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশু শিক্ষকের কাছে কত-টুকু সময় থাকে? বড় জোর ৫।৬ ঘণ্টা। বাকী সময়টা তার বাড়ীতে কাটে পরিজনদের সঙ্গে। ১৮ ঘণ্টা যদি শিশু অপরিচ্ছন্নতা, অনিয়ম, অসংযত ভাষা ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের মধ্যে কাটায় তবে বিদ্যালয়ের সুন্দর ও সুসংযত শিক্ষা থেকে অল্প ফলই আশা করা যেতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচী রচনার সময় পরিশ্রম ও বিশ্রাম সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়ঃ—(১) বিশ্রাম (ক) বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের বিভিন্ন কোষসমষ্টিকে পর্যায়ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া। এজন্য ৭।৮ বৎসরের শিশুকে একাদিক্রমে আধ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ করবার শক্তি, অভ্যাসের ও কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার

শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। এভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুরা এক সঙ্গে ৪ থেকে ৬ঘণ্টা অবধি কাজ করতে শেখে। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রেও বুনিয়াদী শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যেই এমন ব্যবস্থা রয়েছে যাতে খানিকটা কাজ করবার পর শিশুর খানিকটা করে বিশ্রাম জোটে; কারণ, বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে কাজ; সুতরাং, কাজের ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দেবার জন্য, উন্নততর কলাকৌশল বুঝাবার জন্য শিশুর কাজে মাঝে মাঝে শিক্ষককে অবশ্যই সাহায্য করতে হয়। এই বিশ্রামের সময়কে অপচয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। শিল্পের কৌশলকে আয়ত্ত করার জন্য বিভিন্ন পেশীর উপর কর্মীর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা দরকার এবং বিভিন্ন পেশী ও মস্তিষ্ক-কোষের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। কাজ করতে করতে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন পেশীর উপর কর্তৃত্ব কমে আসে এবং বিরামের অবকাশ ভিন্ন সমন্বয়ও পূর্ণ হয় না। সুতরাং বৈচিত্র্য ও বিরতিকে শিক্ষার অঙ্গ বলে ধরা প্রয়োজন, সময়ের অপব্যয় বলে নয়। বৈচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনন্ত রয়েছে। সাধারণতঃ সাফাই, আরোগ্য, অন্ন ও বস্ত্র সম্বন্ধিত-কাজ, খেলাধূলা, ব্যায়াম—এই কাজগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নেওয়া হয়ে থাকে; তাছাড়া নিজেদের স্বায়ত্ত শাসনের কাজটা বিদ্যার্থীদেরই স্বাধীনভাবে করতে হয়। এতদ্ব্যতীত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার আরো দুইটি মাধ্যম আছে—প্রকৃতি ও সমাজ। প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করবার জন্য পর্যবেক্ষণ, উৎসবের অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যবস্থা করতে হয়। এ সকল কাজের অসংখ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের শিক্ষা দেওয়া চলে; কেবল মাত্র কসরতের জন্য বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার সমন্বয় বিধানের জন্য কৃত্রিম ব্যায়ামের প্রয়োজন পড়ে না। (২) যৌবনোদ্গম পর্যন্ত সময়টা শিশুদেহের দ্রুত বৃদ্ধির সময়। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপ্তিও

এই সময়টা পর্যন্ত। দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এই সময়ে প্রচুর নিদ্রার প্রয়োজন। অধিকাংশ শিশুর ভাগ্যে সুপ্রচুর সুনিদ্রা জোটে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণাধীনে শিশুর খানিকটা ঘুমাবার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রথমতঃ আমাদের শিশুরা মুক্ত বাতাসের মধ্যে ঘুমাতে পায় না ; কারণ, সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীর দরজা-জানালা এমনি যে, তাতে বায়ু চলাচলের যথেষ্ট সুব্যবস্থা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ শিশুরা ঠিক ভাবে ঘুমায় না এবং মাতাপিতাও অজ্ঞতাবশতঃ এ বিষয়ে কিছু ভাববার আছে, তা জানেন না। ঘুমোবার সময় মেরুদণ্ডের চারপাশ ঘিরে যে সব স্নায়ুগুলি রয়েছে তার ভেতর দিয়ে অবাধ রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা থাকা চাই ; কারণ, আগেই বলেছি যে, এই রক্ত চলাচলের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমের শুভ যোগটিকে অবলম্বন করে খাদ্যসার আমাদের দেহের কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। অথচ শিশুদের পেটের উপর ভর দিয়ে পাশ ফিরে ঘুমানোর অভ্যাস না করিয়ে প্রায়ই চিত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস করা হয়। তৃতীয়তঃ মশা, মাছি, দুর্গন্ধ, স্যাঁৎসেতে পরিবেশের মধ্যে শিশু গভীর ভাবে ঘুমাতে পারে না। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিশু যখন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তাকে শাস্তি দেওয়া কেবলমাত্র অবিচার নয় —চরম নির্বুদ্ধিতা। এ ভাবে শিশুর শিক্ষা হয় না—এটাই বড় কথা নয়, এ ভাবে আমরা শিশুর জীবনীশক্তিকে নষ্ট করে ফেলি—এটাই হচ্ছে আমাদের সব চাইতে বড় অপরাধ। তাছাড়া আমাদের বিদ্যালয়ের সময়ও এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে যে, ভাত কিংবা পান্তা খাওয়ার পরই আমরা বিদ্যালয়ে আসি। এ সময়ে ঘুম পাওয়াই স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে গেলে বাড়ীর গিন্নীরা তো খাওয়া-দাওয়ার পর নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমাবার জন্যই ছেলেমেয়েদের গুরুমশাইর কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ সাধারণতঃ সকাল এবং বিকাল বেলা হয়। সূর্য্যালোক আমাদের দেহের পক্ষে,

বিশেষতঃ দেহের আরগষ্টেরল থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরী করার কাজে খুবই প্রয়োজনীয়। ভোরের দিকের সূর্য্যালোক শিশু-দেহগঠনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। বিদ্যালয়ে উন্মুক্ত আকাশের তলে যখন শিক্ষক শিশুদের নিয়ে কাজ করেন বা বেড়ান তখন অন্যান্য সদভ্যাস গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশু সূর্য্যালোক থেকে পূর্ণ উপকারও পেয়ে থাকে। তা'ছাড়া এভাবে বিদ্যালয়ের কাজ চললে আহারের পর প্রয়োজনীয় বিশ্রামটুকু থেকেও শিশু বঞ্চিত হয় না। যেখানে বাড়ীতে এই বিশ্রামের কাজ সম্ভব হয় না, সেখানে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের এই বিশ্রামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(২) কাজঃ কাজের জন্য শিশুকে তাড়া দেবার প্রয়োজন অল্পই থাকে। কাজ শিশু অনবরত করতে চায়, কাজ করবার জন্য ছুটাছুটি করে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে যাতে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল হয়, তেমন কাজ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। এ বিষয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা যে সিদ্ধান্তের উপর স্থিত তা হচ্ছে এই যে, শিশুর জীবন কেবল-মাত্র খেলা নয়, শিশুর জীবনে কাজ আর খেলাকে এক করে দেওয়া অতি সহজে সম্ভব। শিশুর জীবনের একটা নিজস্ব মূল্য আছে যা কেবল ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নয়। শিশু সমাজের অঙ্গ ; এজন্য শিশুর যেমন সমাজের ওপর দাবী আছে, তেমনি প্রথমাবধি তার দায়িত্ব পালনে শিশু অনিচ্ছুক নয় ; বরং তার একটা মূল্য আছে, তার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে এবং সে সৃষ্টি নিজের এবং পরের কাজে লাগে, তার একটা আর্থিক মূল্য আছে—এই বোধ থেকে শিশু আনন্দ পায়, প্রেরণা পায়।

শিশুর যুক্তিহীন প্রথম শৈশবের ভিত্তি থাকে আত্মকেন্দ্রিক, প্রধানতঃ দৈহিক—সুখদুঃখ বোধের উপর, অথচ শিশুকে বাস করতে হয় সমাজের মধ্যে। সেখানে সকলের মঙ্গলের সঙ্গে নিজের মঙ্গলকে

—নিজের ভাললাগা, মন্দলাগাকে—মিশিয়ে না দিলে দুঃখের অন্ত থাকে না। এ অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর জন্য কৃত্রিম পরিবেশ রচনায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে রাজী নয়। বিশ্বাস করা হয় যে, যদি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে এমন পরিবেশ শিশুকে দেওয়া যায় যা কৃত্রিম, যাতে নিজের খুশীমত কাজ করারই শুধু সুযোগ আছে, সেখানে শিশু বাস্তব অবস্থাতে তেতে-পুড়ে তৈরী হয় না, পরের ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকতে শিখে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ বেছে নেবার সময় দুটি জিনিষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ঃ শিশুর পরিবেশে তেমন কাজের সুযোগ রাখা হয় যাতে শিশু স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠবে এবং সম্মিলিত-ভাবে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজ করতে শিখবে। এজন্য শিশুকে বাস্তব অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সেই অবস্থাকে উন্নত করার কাজে তার কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে শিশু যেমন নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে শিখে তেমনি সেই পরিবেশকে বিশ্লেষণ ও উন্নত করারও শিক্ষা পায়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য কাজ ঠিক করার সময় শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিশুর স্বাস্থ্য ও গড়ন অনুযায়ী কাজ তাকে বেছে দেওয়া। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম কোন ধরাবাঁধা নির্দেশের সমষ্টি-মাত্র নয়। এখানে এত বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার স্থান আছে যে, একান্ত রুগ্ন থেকে খুব বলিষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যেককেই যথোপযুক্ত কাজ দেওয়া সম্ভব। অনেকের ধারণা আছে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুকে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হয়। এই সন্দেহটি নিতান্ত অমূলক। কিন্তু এখানে শিশুর কার্যক্ষমতাকে ছোট করে দেখা হয় না; তবে কোন কাজের ভার শিশুকে দেবার আগে বিশেষ চিন্তা করে দেওয়া হয়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সমগ্র কাজে শিশু কতটা অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং তার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় ও

প্রয়োজন বোধে সে কতটা অংশ গ্রহণ করে এটাই মুখ্য। বিদ্যালয়ে শিশু যে ৫॥ কিংবা ৬ ঘণ্টা থাকে তার মধ্যে সে প্রায় ২ ঘণ্টা থেকে ৪ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম কিছু না কিছু করে কিন্তু শিশু যখনই ক্লান্তিবোধ করে তখনই তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। শিশুকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া-টাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য নয়, কাজটা যাতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যম হতে পারে, সেটাই লক্ষ্য। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ করার ফলে যদি শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয় তবে বুঝতে হবে যে, কাজ নির্বাচনে শিক্ষকের ত্রুটি রয়েছে।

বিদ্যালয়ের কাজ স্থির করার সময় শিশুর পারিবারিক জীবনকেও অস্বীকার করা হয় না। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে কৃত্রিম প্রাচীরটা রয়েছে সেটা ভেঙে ফেলাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। বাপ-মা যে জীবন যাপন করেন বা পরিবার যে বৃত্তিকে গ্রহণ করেছে সেই বৃত্তিকেই শিশু সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করবে, এমন কোন কথা নেই, কিন্তু পারিবারিক বৃত্তিকে শিশু ঘৃণা করতে শিখবে এমন শিক্ষাও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না। শিশু গৃহের কাজে আনন্দের সঙ্গে সহায়তা করবে, গৃহজীবন ও বৃত্তিকে উন্নত করে তুলবে—এই শিক্ষাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে কাজ দেবার সময় শিশুর পারিবারিক জীবনের কথা ভাবা শিক্ষকের একটি প্রাথমিক কর্তব্য। যেমন ধান চাষের সময় বা কাটার সময় শিশুকে যে পরিশ্রম করতে হয় সেটাও শিক্ষককে বিবেচনা করতে হয়; সম্ভব হলে এই কাজকেই শিক্ষার মাধ্যম করে নিয়ে বিদ্যালয়ের অন্য কাজকে কমিয়ে নিতে হয়। বাড়ীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করে শিশু যদি ক্লান্ত হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বাধ্য হয়ে যথানির্দিষ্ট কাজ করে দিতে হবে, এমন কোন জেদ শিক্ষকের করা উচিত নয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রত্যহ অন্ততঃ আধঘণ্টা সময় পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতার কাজে যায়। সূতা কাটা যেখানে মূল শিল্প সেখানে প্রথম তিন বৎসর এ কাজের জন্য দৈনিক গড়ে ২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে এ কাজের জন্য সময় বাড়িয়ে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত করা হয়। প্রথম চার বর্গে বাগানের কাজ বাধ্যতামূলক। এর জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় রাখা সম্ভব নয়, কাজের প্রয়োজন অনুসারে এজন্য সময় দেওয়া দরকার।

এই সব কাজ করার ফলে শিশুর শরীরের ক্ষতিবৃদ্ধি কি হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে দেখার জন্য স্বাস্থ্যের মাসিক বিবরণী রাখা হয়ে থাকে। এই বিবরণীতে শিশুর বয়স, উচ্চতা, গাত্রোত্তাপ, ওজন, স্বাভাবিক ও প্রশ্বাস নেওয়া অবস্থায় বুকের বেড়, দৃষ্টি—দূর ও নিকট, চোখ—সাধারণ অবস্থা, নাক, কান, জিহ্বা, প্লীহা, যকৃৎ, নাড়ী হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, শ্বাসপ্রশ্বাস, সাধারণ অসুস্থতা সম্বন্ধে বিবরণ রাখা হয়ে থাকে। এ কাজের জন্য প্রতিগ্রামে ডাক্তার পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই পরীক্ষা করার কাজ শিক্ষক চিকিৎসকের সাহায্যে নিয়ে প্রথম ৬মাস করলে তারপর নিজেই করতে পারেন। ভবিষ্যৎ বুনিয়াদী শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্রে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ বর্গের বিদ্যার্থীরা নিজেরাও এই পরীক্ষায় সাহায্য করতে পারে। এ তাদের দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শেখার এবং অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভের একটি অতি সুন্দর মাধ্যম হতে পারে। অথচ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দিক থেকে শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই সব খুঁটিনাটি তথ্য একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ, এরই উপর নির্ভর করে তাঁকে শিশুকে দেয় কাজের প্রকৃতি নির্ণয় করতে হয়। এ সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে; শিশুকাল বাড়বার সময়। যে শিশুর ওজন বাড়ছে না বা যথোপযুক্ত বাড়ছে না তাকে কাজ দেওয়া তো চলবেই না বরং ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে। আজকাল ক্ষয়রোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত

দ্রুত বেড়ে চলেছে। এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই অত্যন্ত সচেতন ও সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন; বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী। দেহের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে যতখানি তা থেকে ৪২ বাদ দিয়ে অবশিষ্টকে ৫॥ দিয়ে গুণ করলে যত হয় দেহের ওজন তত পাউণ্ড হওয়াই উচিত। সাধারণ অবস্থাতেও এ ওজনের তারতম্য কিছুটা হতে পারে, কিন্তু যদি প্রকৃত ওজন উচিত-ওজনের চাইতে শতকরা দশভাগেরও কম কিংবা বেশী হয়, তবে ডাক্তার দেখিয়ে কারণ নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক এবং যথোচিত প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। এমনি ভাবে যে বিদ্যার্থীর ফুস্‌ফুসের অবস্থা ভাল না তাকে তূলার মত সূক্ষ্ম আঁশের জিনিষ নিয়ে কাজ করতে দেওয়া ক্ষতিকর। যার হৃৎপিণ্ড যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তাকে কোদাল চালাবার কাজ বা অনেক পাঁজ করতে দেওয়ার মত কাজ ক্ষতিকর হতে পারে। আমাদের দেশে স্ফীত প্লীহাওয়ালা শিশুর সংখ্যা অত্যধিক; এদের সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং এজন্য পরিবারবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করা দরকার। শিশুদেহ একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল যন্ত্র; সামান্য অজ্ঞতা ও মূঢ় আচরণের জন্য এ যন্ত্রের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষককে এজন্য অতি সাবধানতার সঙ্গে এবং যথেষ্ট জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে একে ব্যবহার করতে হবে।

শিশুর স্বাস্থ্য তার জীবনের বিকাশের মূল ভিত্তি। বুনিয়াদী শিক্ষা এ সত্যকে শুধু স্বীকার করেছে তা নয়; এ সম্পর্কে পরের উপর অসহায়ভাবে একান্ত নির্ভরশীল না হয়ে নিজ শক্তিতে যা করণীয় তা করার শিক্ষা দেওয়াকেই শিক্ষার একটি মূল সত্য বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকে শিক্ষার একটি প্রধান ভিত্তি বলে গ্রহণ করলেও বাস্তবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যসম্মত বিধান

পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অক্ষমতার কারণ প্রধানতঃ ৩টি। (ক) অজ্ঞতা, (খ) আর্থিক অনটন, (গ) সামাজিক পরিবেশ। সমাজের বর্তমান অবস্থার তৃতীয় কারণটি দূর করা সময়সাপেক্ষ। দ্বিতীয় কারণটি দূর করা সম্পর্কে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ রাষ্ট্রের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াবার চাইতে ভিন্ন। অথচ প্রয়োজনীয় সচেতনতাও সমাজে নেই এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোও অনুকূল নয়। অতএব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কারণটিও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে না। কিন্তু প্রথম কারণটি বুনিয়াদী শিক্ষকরা নিজ চেষ্টায় দূরীভূত করতে পারেন।

অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে শিশুর দেহ গঠনের জন্য বহু গুরুতর বিষয়ে আমরা যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেই না। এবারে এরূপ কয়েকটি বিষয়ের কথা আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব ঃ

(১) জলপান ঃ—সাধারণতঃ শিশুর জলপানের উপর বিদ্যালয়ে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রচুর জলপান করা শিশুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাহারা সর্বদাই সক্রিয় থাকে। এজন্য এদের শরীর থেকে সর্বদাই বহুপরিমাণে জল, মূত্র, ঘাম ইত্যাদিরূপে বেরিয়ে যাচ্ছে—এই ক্ষতিপূরণ একান্ত আবশ্যক ; নইলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে খাদ্য দেহের সকল কোষগুলিতে পৌছাতে পারে না। গ্রামের বাড়ীতে সাধারণতঃ যেভাবে জল রাখা হয় ও জলপানের ব্যবস্থা করা হয় তা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বহুরোগ আমাদের দেশে জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য বিশুদ্ধ জল সংরক্ষণ ও পানের আদর্শ অভ্যাস গঠন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রতিদিন শিশু যেন বিদ্যালয়ে নিয়মিত সময়ে অন্ততঃ এক সের জল পান করে, সেটা দেখা দরকার। এজন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি সময় স্থির করে দেওয়া প্রয়োজন। শিশুরা এসব সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে জলপান করবে। পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখা ও

সুশৃঙ্খলভাবে সে জল পান করার মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞানলাভের কাজও নেহাৎ কম হবে না।

(২) মুক্ত আলো-বাতাস :—আমাদের চারপাশের আলো ও মুক্তবায়ু যে আমাদের কতবড় বন্ধু তা আমরা হয়ত কখনও গভীর ভাবে ভেবে দেখি না। ভোরের আলোর উত্তর বেগুনী রশ্মি, সূর্য্যালোকের ভিটামিন 'ডি' সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমরা অধিকাংশ সময় কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞতার জন্য কাজে লাগাতে পারি না। এই আলো-বাতাসের মুক্ত চলাচলের পথ রুদ্ধ করেই গ্রামে আমরা নানা ব্যাধিকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। বাইরে যখন সুন্দর সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশ আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে আলো জ্বালিয়ে জ্ঞানের সন্ধান করি, এতে যে স্বাস্থ্যের আলো নিবু নিবু হয়ে উঠে, সেদিকে আমাদের খেয়ালই থাকে না। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু যেন সকাল বিকালে অন্ততঃ খানিকটা সময় সূর্য্যালোকের নীচে মুক্ত বাতাসে খোলা গায় কাজ করার সুযোগ পায় এটা দেখা একান্ত কর্তব্য।

আমাদের দেশে তরুচ্ছায়ায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসত। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের পাড়াগাঁয়ের বর্তমান পাঠশালা, এমনকি কলকাতা সহরের পাকা কোঠাবাড়ীওয়ালা আধুনিক বিদ্যালয়ের চাইতেওতা অনেক বৈজ্ঞানিক ছিল। একেই তো আমাদের দেশে একগাদা লোক বাড়ীতে ঠেসাঠেসি করে এক ঘরে ঘুমায়। তাতে আবার অধিকাংশ ঘরবাড়ীতে বায়ু চলাচলের যথেষ্ট সুব্যবস্থা থাকে না। আমাদের মনে রাখা দরকার যে বায়ুতে আমাদের শত্রু অসংখ্য বীজাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। বদ্ধ হাওয়ায় তারা আমাদের আক্রমণের সহজ সুযোগ পায়—খোলা হাওয়ার স্রোতে তারা ভেসে যায়, ছড়িয়ে পড়ে, আক্রমণের তীব্রতা কমে যায়। সুতরাং শিশুরা যদি বাড়ীতে বদ্ধ ঘরে সারারাত ঘুমাবার পরেও বিদ্যালয়ের এঁদো কুঠরীর বাইরে খানিকটা সময় কাটাবার সুযোগ না পায় তবে

তা শিশুদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। শিশুরা সহজেই বীজাণুর আক্রমণে কাবু হয়ে পড়ে—খোলা হাওয়া ওদের পক্ষে অতি বড় বন্ধু। সুতরাং পাঠশালার জন্য উপযুক্ত ঘর নেই বলে আলো-বাতাসহীন ঘরে বা নীচু নোংরা দাওয়ায় পাঠশালা না করে এজন্য খোলা জায়গা নির্বাচন করা অনেক ভাল। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা আসে—তাদের সকলে নীরোগ হবে, এমন কোন কথা নেই। অন্ততঃ শিশুদের মধ্যে সর্দিকাশিটা যথেষ্টই থাকে। বদ্ধ হাওয়ায় ঘরের মধ্যে এই রোগগুলির ছড়িয়ে পড়া খুবই সহজ। তাছাড়া অনেক ছেলে-মেয়ের নিশ্বাস থেকে ঘরের হাওয়া আর্দ্র ও উষ্ণ হয়ে ওঠে, শিশুদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই জিনিষটাও ক্ষতিকর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সূতাকাটা, ধুনাই করা ইত্যাদি কাজের জন্য খানিকটা সময় অপেক্ষা-কৃত কম হাওয়ায়, বদ্ধ ঘরে বাধ্য হয়ে কাটাতে হয়, এরপর খোলা হাওয়া গায়ে লাগান একান্ত আবশ্যক।

(৩) সুনিদ্রার অভ্যাস :—ঘুমানো সম্পর্কে আগেই বলেছি। ভাল দেহভঙ্গী এবং গভীরভাবে ঘুমান সুস্থ দেহের পক্ষে অপরিহার্য। এই অভ্যাস ছোটবেলা থেকে গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে খানিকটা ঘুমানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেকে বলেন যে, স্বল্প দিবানিদ্রার ফলে শিশুরা রাত্রে গভীরতর ভাবে ঘুমায়।

(৪) শিশুদের দেহ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় যে কোন বাধা তার পক্ষে ক্ষতিকর। আঘাত বা অসুস্থতা এজন্য শিশুর পক্ষে খুবই মারাত্মাক। হঠাৎ যাতে শিশু আঘাত না পায় সেদিকে শিক্ষককে সর্বদা দৃষ্টি দিতে হয়। তার খেলাধূলার জিনিষগুলি এমন হওয়া দরকার যাতে শিশুর হঠাৎ আহত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। বয়স্কদের প্রয়োজনের জিনিষগুলি শিশুর খেলার পক্ষে প্রায়ই মারাত্মক, সুতরাং

সেগুলিকে একটু যত্ন করে রাখা দরকার। শিশুর খেলার জিনিষগুলিও যেন তার পক্ষে অতিবৃহৎ না হয়। উঁচু ও বড় জিনিষ অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে; কারণ, শিশু খেলার সময় প্রায়ই আত্মভোলা হয়ে যায়।

সর্দিকাশি, পাচড়া ইত্যাদি সংক্রামক রোগ থেকে শিশুকে সযত্নে রক্ষা করা দরকার। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সংক্রমণের ভয় যেখানে আছে সেখানে সেই সব শিশুদের সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা দরকার। হাম, সর্দি, ঘা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মাত্র শিশুদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বর্গে পাঁচড়া, দাদ, খোস ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত শিশুদের আলাদা করে বসাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই বয়সের শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে ; সুতরাং, রোগের আক্রমণ এ সময়ে প্রায়ই মারাত্মক হয়ে ওঠে। এজন্য পর্যাপ্ত সাবধানতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৫) শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য তার মানসিক শান্তি কম দায়ী নয়। মায়ের স্থান বিদ্যালয়ে শিক্ষককেই গ্রহণ করতে হয়। যদি শিশু বিদ্যালয়ে আনন্দ বোধ না করে, যদি সম্পূর্ণ নিরাপত্তার, নির্ভয়তার মধ্যে না থাকে তবে সকল শিক্ষা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকবে।

আমরা এখানে যে কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বললাম সেগুলি সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করাও কঠিন নয়। সুতরাং, যতদিন না বুনিয়াদী শিক্ষা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থারূপে সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন সহজেই সাধারণ বিদ্যালয়েও এই সকল ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকে সহজসাধ্য করে তোলা সম্ভব।

শিশুর মানসিক বিকাশ—শিশু মন ও কাজ

দেহ, মন, আত্মা নিয়ে মানুষ। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য এই সমগ্র মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। ইতিপূর্বে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে কি ভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; এবার আমরা বুদ্ধির বিকাশের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে কি ভাবে চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তার আলোচনা করব।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাথারা কাজের মানুষ হয়, একথা বুনিয়াদী শিক্ষার কঠোর সমালোচকরাও স্বীকার ক'রে থাকেন। তাঁদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এই যে, এখানে শিশুদের 'লেখাপড়া' শেখার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয় না। অনেক বুনিয়াদী শিক্ষকের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানি। তাঁরা যখন গ্রামে গিয়ে কাজ সুরু করেছেন তখন এমনিতর কথা তাঁরা অনেক শুনেছেন যে, অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের মেথরের, কাটুনির বা চাষীর কাজ করবার জন্য শিক্ষা-লয়ে পাঠাবেন না; যদি মাষ্টারমশাই 'লেখাপড়া' শেখাতে চান তবে পাঠাতে পারেন। বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের কাছ থেকে শুধু এই কল্পিত অপরাধের জন্য, শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অশিক্ষিত শিক্ষকের কাছে তাদের লেখাপড়া শিখতে দেওয়া হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্যান্য কারণ গৌণ; প্রধান কারণ বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা সবাই সূতাকাটা, কৃষি ইত্যাদি কাজই মাত্র করে, লেখাপড়া যথেষ্ট শিখে না এই আশঙ্কা! ফলে যে ছেলে হয়ত সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে, পথে বিপথে ধূলা কাদা মেখে নানাবিধ কুকীর্তি ক'রে সময়

কাটাতো তাকে যখন শিক্ষক স্নেহের টানে শিক্ষালয়ে এনে হাজি করেন তারপর একটি মাস যেতে না যেতে হঠাৎ-সচেতন অভিভাবক এসে দাঁড়ান উদ্যত প্রশ্ন নিয়ে "মাষ্টারমশাই আমার ছেলেকে তো ইস্কুলে আনছো কিন্তু লেখাপড়া সে তো শিখছেনা কিচ্ছুটি।" নিরক্ষর গ্রামবাসীরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে, ভাবে—"বাবুদের যত স্কুল-কলেজ আর আমাদের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার ফ্যাকড়া, যাতে আমরা 'লেখাপড়া' শিখে মানুষ না হতে পারি তাই।" তারা ভাবে 'লেখাপড়া' শেখার একমাত্র তীর্থ হচ্ছে আমাদের বর্তমান স্কুল-কলেজগুলি ; আর কর্মপ্রধান বুনিয়াদী শিক্ষালয়গুলি হচ্ছে তাদের ভুলিয়ে তাদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা মাত্র। সুতরাং তারা হুজুগে মত্ত স্বদেশীওয়ালাদের এড়িয়ে অনিচ্ছুক ঘোড়ার মত দুর্দান্ত ছেলেকে গুরুমহাশয়ের কাছে পাঠায় বেত খেয়ে শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক হবার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি স্নেহছায়াশীতল, ক্রীড়াকৌতুক আকর্ষণীয় বুনিয়াদী শিক্ষালয় ছেড়ে শিশুকে একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অন্য হাতে ধারাপাত ধ'রে অর্থহীন কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া দিনের পর দিন মুখস্থ করতে হচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এমনিতর ধারণা যে কেবলমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষার বিরোধী অথবা অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাও নয়, সাধারণভাবে আমরা যাঁদের উচ্চশিক্ষিত বলতে পারি তেমন জনসাধারণ কেন, তেমন কংগ্রেসসেবী গঠনমূলক কর্মপন্থায় বহুলাংশে বিশ্বাসী, গান্ধীজীর বিশিষ্ট অনুরাগীদের মধ্যেও এমন ধারণা রয়েছে। এই ধারণার ফলে, বুনিয়াদী শিক্ষার সুখ্যাতি এঁরা করেন—কংগ্রেসের নীতি এবং নির্দেশ প্রচার করতে হবে বলেই অথবা জনসাধারণের জন্য কমখরচে এ ছাড়া অন্য কোন রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এই ভেবে,—বুনিয়াদী শিক্ষা একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি

এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নয়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে যাঁরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তুলতে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে, তাঁরাই হয়ত নিজেদের ছেলেমেয়েদের সযত্নে স্কুল-কলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে যে শর্ষে নিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে সেই শর্ষের মধ্যেও ভূত। বুনিয়াদী শিক্ষকদের কাছেও বহুক্ষেত্রে এই নূতন শিক্ষাদান-পদ্ধতির অর্থ স্পষ্ট নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে গোড়ার দিকে শিক্ষাদান-পদ্ধতি নিয়ে হাস্যকর আলোচনা হয়েছে। কেউ বা প্রশ্ন করেছেন,—"সূতাকাটার মধ্য দিয়ে সঙ্গীত শেখানো হবে কি ক'রে।" কেউবা চরকার ভেতর দিয়ে কতখানি সঙ্গীত শেখানো যায় তারই গবেষণায় মত্ত হ'য়ে উঠেছেন। কেউ বা চরকার মাধ্যমে তারা চেনানোর সমস্যা নিয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন; আবার কেউ বা চরকার চক্রটিকে তারার সঙ্গে তুলনা ক'রে সেই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবতারণা করেছেন। সেই হাস্যকর প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি এখনও ঘটেনি। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ভূত ঘাড় থেকে নামানো কঠিন। ফলে, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, মাতৃভাষা ইত্যাদি বিষয়ের নামগুলিই শিক্ষকের কাছে প্রধান হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে বলেই অনেক ক্ষেত্রে একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও হাতে নেওয়া হয়। কোন কোন শিক্ষক একটা সামান্য মাত্র উপলক্ষ নিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য শিক্ষার্থীর উপর উজার ক'রে দেবার চেষ্টা করেন; আবার কেউ কেউ যান্ত্রিক নিপুণতার দিকেই সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে এই সকল ভ্রান্ত ধারণার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি খুবই ব্যাহত হয়েছে। আজ বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হতে

চলেছে। ভ্রান্ত ধারণার ফলে, জনসাধারণের পক্ষে সাগ্রহে এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যে সত্যই একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-পদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করছি, এ সম্পর্কে আমাদের নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের সাধারণ স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাদানপদ্ধতি প্রচলিত আছে তার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ পদ্ধতি যে একান্ত ত্রুটিপূর্ণ, একথা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্ণধাররাও স্বীকার করেন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই পদ্ধতির সর্ব-প্রধান ত্রুটি এই যে, এটা শিশুর শিখার পদ্ধতি নয়—শিশুকে শেখানোর পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় শিশু প্রধান নয়; শিশুর আগ্রহ, অনাগ্রহ, শিশুর প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না পর্যন্ত; কতকগুলি অক্ষর আর সংখ্যার সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের বিদ্যাভ্যাস সুরু হয়। শিশুর কাছে এই অক্ষর ও সংখ্যাগুলি একান্তই অর্থহীন। ফলে, এগুলি শেখার জন্য শিশু নিজের মধ্যে কোন তাগিদ বোধ করে না। তাই জোর করে শেখাবার চেষ্টা করতে হয় আর শিশুর মনটাও সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার দিকে বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে। তাগিদে আর শাস্তিতে মিলিয়ে অক্ষর পরিচয় শেষ না করতেই আসে 'অজ,' 'আম,' 'ঐক্য,' 'বাক্য', কুবাক্য' প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজনীয় শব্দের বিভীষিকাময় স্তূপ। অনেক শিশুরই বিদ্যাভ্যাসের আগ্রহটা টেনেটুনে এতখানি এসেই একেবারে নিঃশেষে শেষ হয়ে যায়। সংখ্যার বেলাতেও তেমনি। শিশুকে ১,২,৩,৪ ইত্যাদি চেনার পালা খানিকটা শেষ করে অর্থহীন কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্থ করতে হয়। সারা জীবনে যে সব শিক্ষা প্রয়োগ করার কোন সুযোগই জোটে না, তারই অভ্যাসে শিশুবয়সের অনেকখানি মূল্যবান সময় নিরানন্দে কেটে যায়।

যে ভিত্তির ওপর শিক্ষা দৃঢ় হয়ে দানা বাঁধে সে হচ্ছে আগ্রহ। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে মুখস্থ করার ওপরই প্রধানতঃ জোর দেওয়া হ'য়ে থাকে। আমরা সকলেই জানি যে, যে সম্পর্কে আমাদের কোন আগ্রহ নেই তা সহজে মুখস্থ হতে চায় না আর হলেও দীর্ঘকাল মনে থাকে না। আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, চঞ্চল মন বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ায়। বিদ্যালয়ে শিশু-দের বেলায় ঠিক এই জিনিষটিই ঘ'টে থাকে। যেহেতু পাঠ্যবস্তুর কোন প্রয়োজনীয়তা শিশু নিজে বুঝতে পারে না এবং তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, সেজন্য শিশু পাঠ আয়ত্ত করার জন্য নিজের সর্বশক্তিকে নিয়োগ করার কোন প্রেরণা পায় না, তার মন চঞ্চল হ'য়ে থাকে। ফলে পাঠ্য-পুস্তক ছেড়ে তার মন খেলার মাঠে, পুকুর ধারে, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বিদ্যালয় তার কাছে বন্দিশালা হ'য়ে ওঠে।

শিশুর মধ্যে শেখার আগ্রহ নেই, একথা ভাবলে একান্তই ভুল ভাবা হবে। জীবনের প্রথম তিন বৎসর শিশু নিজে নিজে যতটা শেখে সেটা বিচার করলে শিশুর শেখার আগ্রহ এবং শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। নবজাত শিশু যখন চোখ মেলে চারদিকে চায় তখন সবই তার অপরিচিত। সেই নিরন্ধ্র অজ্ঞতা থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু তিন বৎসরের মধ্যে নিজের পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ক'রে নেয়, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন ক'রে ফেলে। মাতৃভাষাতে নিজের মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে। এটা সম্ভব হয় শিশুর অপরিসীম আগ্রহ এবং সর্বেন্দ্রিয়কে যথাসাধ্য ব্যবহারের ফলে। মা থেকে মাসীকে আলাদা করার জন্য শিশু চোখ বন্ধ ক'রে মুখস্থ করতে বসে না ; তার দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণশক্তি, তার নানাবিধ প্রয়োজনে মা ও মাসীর স্থান, এ সমস্তই তার মা ও মাসীকে চেনার উপাদান সংগ্রহ করে এবং এরই উপর ভিত্তি ক'রে শিশু নিজের সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিশুকে এই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি। শিক্ষা ব্যাপারে তার আগ্রহ, তার স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার আমরা আর কোন মূল্য দেই না ; আমরা—বড়রা—যে জিনিষ শিশুর শেখা উচিত ব'লে মনে করি, তাই তাকে শিখতে বাধ্য করি। আমরা বলে থাকি যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যে জিনিষ নেই তাকে চিন্তা করতে পারাই বুদ্ধির বিকাশের একটা প্রধান লক্ষণ। এইখানেই মানুষ অন্য জীবজন্তু থেকে আলাদা। বিদ্যালয়টা হচ্ছে সেই বুদ্ধির চাষের জন্য কসরৎ করার স্থান। এটা ঠিক যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সামনে যা আছে সেইটুকুই যদি ভাবি তবে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলা হয়। কিন্তু এই কারণে এর বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হবারও কোন যুক্তি থাকে না। সব গোলাপী গোলাপের গন্ধ ভারী মিষ্টি—আমরা যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন সবগুলি গোলাপ নিশ্চয় আমাদের সামনে থাকে না। তাই ব'লে কোন গোলাপী গোলাপ না দেখে 'গোলাপের গন্ধ অত্যন্ত মিষ্ট' এই কথা মুখস্থ করলেও শিক্ষা একান্তই কাঁচা থেকে যায়। মানুষের চিন্তার ক্ষমতা মানুষকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানের বিশ্লেষণ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হবার শক্তি দেয় সত্য ; কিন্তু এজন্য যদি আমরা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার দ্বারা উপাদান সংগ্রহের কাজ ছেড়ে দেই তবে ভিত-ছাড়া ঘর গড়ার মত সেটা অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশের সাধারণ স্কুল-কলেজে আমরা এই অসম্ভব পথই বেছে নিয়েছি। আমরা ভুলে যাই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানকে বিশ্লেষণ ক'রে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর শক্তি অর্জন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ; এই শক্তিই আমাদের স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা দেয়, এটাই শিক্ষার গোড়ার কথা। সাধারণ বিদ্যালয়ে এই শক্তি বিকাশের উপায়স্বরূপ শিশুর সক্রিয় অংশ গ্রহণকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা তাকে কতকগুলি খবর

এবং সিদ্ধান্ত মুখস্থ করতে বলি। এর ফলে কোন বিষয়ে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার শক্তি শিশু হারিয়ে ফেলে। জগতে তথ্যের সংখ্যা অনন্ত। তার সবগুলিকে, এমনকি একান্ত প্রয়োজনীয় সবগুলিকেও মুখস্থ ক'রে রাখা সম্ভব নয়। অথচ প্রতি মুহূর্তেই আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সবগুলি সমস্যার সমাধান মুখস্থ ক'রে রাখতে পারলে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে পারলে আমাদের সমস্যা খুব সহজ হ'য়ে যেত সন্দেহ নেই; কিন্তু বাস্তব জগতে তা ঘটা সম্ভব নয়। এখানেই আমাদের বিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন; এরকম সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে মীমাংসা করতে পারব আশা করেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, শিখি আমরা কেবল কতকগুলি তৈরী সমস্যার তৈরী সমাধান মুখস্থ করতে ও স্থানে-অস্থানে উদ্গীরণ করতে—সাক্ষাৎভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ও তার সমাধান করার কৌশল শেখার সুযোগ আমাদের শিক্ষালয়ে জোটে না।

শিক্ষককেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের এই সকল ত্রুটি শিক্ষাবিদ্‌দের নজরে অনেক আগেই পড়েছে। অন্যান্য দেশে এই সকল ত্রুটি দূর করার চেষ্টাও চলেছে অনেক দিন ধ'রে।

মন্তেসরী প্রথায় যাঁরা শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁরা অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকেন শিশুর আগ্রহ সৃষ্ট হবার জন্য। শিশুর আগ্রহ জন্মান মাত্র তাঁরা সেই সুযোগটি গ্রহণ করেন এবং শিশু যাতে সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু এই মন্তেসরী বিদ্যালয়গুলি কৃত্রিম জগৎ। বাস্তব জীবনে শিশুদের জন্য আলাদা রাজ্য কোথাও নেই, তাদের খেয়াল খুসীমত জগৎ চলেও না। বাস্তব পরিবারে বিভিন্ন বয়সের মানুষ এক সঙ্গে বাস করে, পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে হয় সকলকে। এ কথা সত্য যে, শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সামঞ্জস্য বিধানটা সহজতর হয়ে

উঠতে পারে। আজকাল শিশুদের দিক থেকে আমরা কোন বিচার করি না। বাড়ী বড়দের সম্পত্তি—তাদের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে বাড়ীর সব কিছু পরিচালিত হয়। আমাদের এই অনুভূতির অভাব অশিক্ষা-প্রসূত।

প্রজেক্ট পদ্ধতি, ড্যালটন পদ্ধতি প্রভৃতিতে শিশুকে ক্রিয়াশীল ক'রে তোলার ব্যবস্থা করা হয় এবং নিজের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই শিশু এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও শিশু যে সকল কাজ করে তা তার জীবনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। এ সকল পদ্ধতিতে যে সকল কাজ নির্বাচন করা হয় তা জীবনের তাগিদে করা হয় না, শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেই করা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে কাজটা গৌণ, শিক্ষাই মুখ্য। পাঞ্জাবের অন্তর্গত মোগা শিক্ষালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা একবার পোষ্ট অফিস প্রজেক্ট নিয়েছিল। কি ভাবে কাজটি নির্বাচন ও সম্পন্ন করা হয়েছিল নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

প্রথম দিন শিক্ষক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা সারা বছর শ্রেণীর করণীয় হিসাবে কোন্ কাজ বেছে নিতে চায়। সেদিন তাদের চিন্তা করার অবসর দেওয়া হ'ল। পরদিন শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন তারা কি স্থির করেছে। কেউ বলে, গম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে চায়, কেউ বলে বাগান করতে এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রী করতে চায়, কেউ বলে পোষ্ট অফিস খুলতে চায়। এরকম ভাবে অনেকগুলি কাজের ফর্দ তৈরী হল। কোন্ কাজ শ্রেণীর জন্য বেছে নেওয়া হবে তা স্থির করার জন্য বিতর্ক সুরু হোল; প্রত্যেকেই নিজের প্রস্তাবিত কাজটি গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে যুক্তি দেখালে। দেখা গেল, প্রত্যেকেই যথেষ্ট ভেবেছে এবং গুছিয়ে বলতেও পেরেছে। এই বিতর্কের ফলে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা আরো খানিকটা বাড়ল।

যারা পোষ্ট অফিস তৈরী করা হোক ব'লে প্রস্তাব করেছিল তাদের যুক্তি এত সুন্দর ও এত জোরাল হল যে, শ্রেণী প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ঐ কাজটিই বেছে নিল। তারপর সুরু হ'ল সত্যিকারের পোষ্ট অফিস গড়ার পালা। ছাত্ররা কাজে একেবারে মেতে উঠল। প্রথমেই পোষ্ট মাষ্টার ও অন্যান্য কর্মী নির্বাচন করা হ'ল! ঘরের নক্সা তৈরী করা, ভেতরে ব'সে কাজ করার মত পোষ্ট অফিসের ঘর তৈরী করা, বিভিন্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করা, সবই চলতে লাগল পুরোদমে। বিদ্যালয়ের জন্য ডাকটিকিট বিক্রী করা, চিঠি ডাকে পাঠান, চিঠি বিলি করা, চাকর-বাকরদের জন্য চিঠি লিখে দেওয়া, হিসাব পত্র ঠিকঠাক ক'রে মেলান, বিভিন্ন কাজের জন্য ডাক-টিকিটের খরচ হিসাব ক'রে বের করা—সব কাজই ছেলেরা নিজেরাই করল। এতে লেখা-পড়ার ও হিসাবের কাজ তাদের অনেকখানিই করতে হ'ল। এই লেখাপড়া বা হিসাবের কাজকে ছেলেরা শ্রম ব'লে ভাবল না, আনন্দ আর খেলা বলেই গ্রহণ করল। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে পোষ্ট অফিস সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ওরা লাভ করল, বিভিন্ন স্থানের অবস্থান সম্বন্ধে যা জানল, হিসাবপত্র রাখা এবং পোষ্ট অফিসের কাজ সম্পর্কে যে শিক্ষা পেল, তার মূল্য অনেকখানি। মুখস্থ করতে হ'লে এতটা শেখান এত অল্প সময়ে কিছুতেই সম্ভব হোত না, আর সে শিক্ষা যে স্থায়ী এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ হোত না, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণই নেই।

এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই :—(ক) প্রথমতঃ এখানে শিশুর শিক্ষাটাই লক্ষ্য। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা অনেকখানি পেয়ে গেল, এটাই বড় কথা, কি কাজ সে করল তা মুখ্য নয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ কাজটা এমন নয়, যা শেখা শিশুর জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। শিশুর জীবনের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সবটুকুর ব্যবস্থা এখানে সমাজ করেছে, তাই শিশুর শিক্ষালয় তার খেলাঘর হতে পেরেছে এবং

শিশু সেখানে তার খেলা নিয়ে মগ্ন থাকতে পেরেছে। শিশুর কাজ এখানে উৎপাদনমূলক নয়, নেহাৎই তার খেলা। সঙ্গতিপন্ন বাবা-মা যেমন শিশুকে সহজেই আব্দার করতে দিতে পারেন এবং সে আব্দার মেটাতেও পারেন, তেমনি এখানে সঙ্গতিপন্ন সমাজ শিশুকে তার খেয়াল মত খেলা নির্বাচন করতে দিয়েছে।

শিশুকেন্দ্রিক রচনাত্মক শিক্ষার মূলসূত্রের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষাদান পদ্ধতির আঙ্গিক অনেকটা এক হলেও কাজ নির্বাচন এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলগত পার্থক্য আছে।

প্রথমতঃ শিশুকে আগ্রহশীল ক'রে স্বেচ্ছায় তাকে শিক্ষা গ্রহণ কার্যে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা বুনিয়াদী শিক্ষারও লক্ষ্য; কিন্তু শিশুর আত্মকেন্দ্রিক খেয়ালকে বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। শিশু যদি শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে তবে তাকে বিশ্রাম দেওয়া, ঘুমোবার সুযোগ দেওয়া বুনিয়াদী শিক্ষক অবশ্যই কর্তব্য ব'লে মনে করবেন; কিন্তু শিশু কাজ করতে চায় না, সুতরাং, সে একটু ঘুরবে, একটু বেড়াবে, তার মর্জি না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ দেওয়া চলবে না, একথা বুনিয়াদী শিক্ষক স্বীকার করবেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিশু সাধারণতঃ কাজ করতেই চায়, কাজ করতে না চাওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক; আমরা আমাদের বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা থেকেই কর্মবিমুখতা শিশু-মনে সংক্রামিত ক'রে থাকি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক রীতির জন্য শিশু অনেক কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, আবর্জনা পরিষ্কার করা ইত্যাদিকে আমরা হেয় কাজ ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, ফলে শিশুও এমনি ভাবে ভাবতে শেখে এবং এরই ফলে বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা আরো ভাল ক'রে শেকড় ছড়াবার সময় পায়। এক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষক অবশ্যই জোর ক'রে কাজটি শিক্ষার্থীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কর্তব্য

সমাপন করবেন না। শিক্ষককে নিজে কাজ ক'রে আদর্শ স্থাপন করতে হবে; স্নেহ, যুক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীর আপত্তিকে স্তব্ধ করতে হবে, কাজের ফলাফল দেখিয়ে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অন্যদিকে শিক্ষককে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তিনি শিশুকে কেবলমাত্র তার খেয়ালের ওপর ছেড়েও দিতে পারেন না। ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করা শিশুর সাধ্যায়ত্ত, তা করতে শিক্ষার্থীকে প্রণোদিত করা, এমন কি প্রয়োজন হলে বাধ্য করাই বুনিয়াদী শিক্ষকের কাজ। আমাদের অনেক অনিচ্ছা অনভ্যাস বা ভুল শিক্ষাপ্রসূত। এই কর্মবিমুখতা কেবলমাত্র উপদেশ দিয়ে দূর করা যায় না, সক্রিয়-ভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই বিপরীত সংস্কার কেটে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে কাজ নির্বাচন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও মূলতঃ ভিন্ন। কাজের অপরিহার্যতাই এখানে কাজ নির্বাচনের প্রধান কারণ। বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে যে কাজ নেওয়া হয়ে থাকে, তা কেবল খেলা নয়, জীবন ও পরিবেশকে সত্যসত্যই সুন্দরতর ক'রে তোলা এই কাজের লক্ষ্য। যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, বুনিয়াদী শিক্ষালয় তারই একটা অঙ্গ। এইখানে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশু সত্যিকারের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে, সত্যিকারের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবে এবং নিজের কাজ ও সৃষ্টিক্ষমতা দিয়ে এই পরিবেশ ও জীবনকে সুন্দরতর ক'রে তুলবে—এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষালয়ের সীমার মধ্যে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশু নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করতে সুরু করে; সে জানতে পারে যে, তারও করণীয় আছে, ঐশ্বর্যরচনার শক্তি আছে, সমাজকে দান করার ক্ষমতা আছে।

এইখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাজের আকর্ষণীয়তাই শিক্ষার

ক্ষেত্রে কাজ নির্বাচনের কারণ না হয়, তবে যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা, সে আগ্রহ সৃষ্টি হবে কি ক'রে? কাজ তো তখনই বোঝা, যখনই তা পরের হুকুমে করতে হয়। সারাদিন অফিসের ফাইল ঘেঁটে আমরা খেলার মাঠে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করি। ব'সে ব'সে ফাইল দেখা আমাদের কাছে বোঝা হয়ে যায়, আর ঘর্মাক্ত কলেবরে বলের পিছনে ছুটাছুটি করা হয় বিশ্রাম। এর কারণ কি এই নয় যে, খেলি আমরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে, আর ফাইল দেখি জীবিকা সংস্থানের জন্য পরের হুকুমে? শিক্ষালয়ে শিশুরা যদি নিজের অন্তরের প্রেরণায়, ভেতরকার তাগিদে কাজ বেছে না নেয় তবে তাতে আনন্দ পাবে কি ক'রে, সে কাজে তার আগ্রহ জন্মাবে কি ক'রে?

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হুকুম দিয়ে কাজ করান হয়, একথা ঠিক নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায়, শিক্ষকের সাহচর্যে ও আদর্শে শিশু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কাজ করে। তবু কখনও কখনও শিশুদের খানিকটা বাধ্য করেও কাজ করাতে হয়। এই অবস্থা সৃষ্ট হবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, শিশুদের মন চঞ্চল। কোন একটা বিষয়ে সাধারণতঃ এরা দীর্ঘকাল মনঃসংযোগ করতে পারে না। কিন্তু চঞ্চলতাকে কেবলমাত্র প্রশ্রয় দিলে শিক্ষা ব্যাহত হয়। এজন্য অতি ধীরে ধীরে হলেও এই চঞ্চলতাকে ব্যাহত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান সমাজের সংক্রমণে শিশু কর্মকুণ্ঠ, শ্রমবিমুখ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়। শিশুর মধ্যে এই শ্রমকুণ্ঠ দেহ-সচেতনতা তার পশুত্বের প্রকাশ; একে অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। শিশু অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম প্রথম কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে দৈহিক আরামের অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে। এটা শিশুর ভেতরকার মনুষ্যত্বের প্রকৃত চেহারা নয়, ওটা তার মধ্যকার পশুত্বের খাদ। আমরা জানি যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে দৈহিক কাজকে এড়িয়ে যাবার

সুযোগ আমরা যেখানে পাই, সেখানে এই ভয় চিরকাল আমাদের কাবু ক'রে রাখে, আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশে বাধা দেয়। এরই ফলে শীতের রাতে আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েও লেপের তলা ছাড়তে হবে এই ভয়ে জ্বরের দোহাই দিতে আমাদের বাধে না। সুতরাং, শিশুর দেহ-সচেতন মনের বিচারে আকর্ষণীয় নয় ব'লে আমরা যদি একান্ত করণীয় কাজকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ তাদের দিই, তবে তাদের এই পশু-প্রকৃতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

আপাতদৃষ্টিতে পরিশ্রমসাপেক্ষ ব'লে যে কাজ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করি, তেমন কাজও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যদি তার মধ্য দিয়ে আমাদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে, তার মধ্য দিয়ে আমরা আনন্দের খোরাক পদে পদে পাই। এই আনন্দের স্বাদ লাভ করলে পরিশ্রম আর দুঃখ থাকে না। এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই শিল্পীর জীবনে, বিজ্ঞানীর জীবনে। প্রকাণ্ড চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে বিজ্ঞানী নূতনের সন্ধানে মগ্ন হয়ে থাকেন, উগ্র দুর্গন্ধের মধ্যে রাশি রাশি টেষ্ট-টিউব নিয়ে রাসায়নিক তার জীবন কাটিয়ে দেন, হাতুড়ী-বাটালী নিয়ে শিল্পী অক্লান্তভাবে স্বপ্নকে রূপ দিয়ে চলেন। এ সম্ভব হয় আনন্দের রসে মন পুষ্ট হয়ে থাকে ব'লে।

আমাদের জীবনের জন্য সব চাইতে অপরিহার্য হচ্ছে তিনটি জিনিষ—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। সমাজে অভাব রয়েছে তিনেরই, এদের সুন্দরতর করার সুযোগ রয়েছে অনন্ত; বুদ্ধিযুক্ত প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা এ সকল সমস্যার সমাধান ক'রে আমাদের পরিবেশকে সুন্দরতর ক'রে তুলতে পারি। একাজ পরিশ্রমসাধ্য সন্দেহ নেই; কিন্তু যেহেতু এখানে সৃষ্টির সুযোগ, নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করার সুযোগ রয়েছে অনন্ত, সেজন্য একাজে মগ্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। নিজের পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষার গোড়া-

পত্তন হয়, এই পরিবেশ সম্পর্কে তার আকুল আগ্রহ থাকে ব'লেই প্রকৃতির হাতে শিশুর প্রথম পাঠ গ্রহণের কাজ এত দ্রুত হয়। আজ-কাল সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুকে এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে আনা হয়। ফলে নিজের শ্রেষ্ঠ ভালবাসার ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যেমন একটা নিস্পৃহ ভাব আসে, শিশুর মধ্যেও তেমনি একটা ভাবের সৃষ্টি হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুকে আবার প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়; নিজের পরিবেশকে সুন্দরতর ক'রে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যদিও বা শিশু প্রথমে কোন ক্ষেত্রে একটু দ্বিধা করে, তবু একবার কাজ সুরু করলে নিজের শক্তিকে সফলভাবে প্রয়োগ করার, নিজের সৃষ্টি-ক্ষমতাকে একবার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলে, কাজের মধ্যে একেবারে মগ্ন হয়ে যায়। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে অন্ন, বস্ত্র এবং গৃহ ও সরঞ্জামবিষয়ক শিল্পকেই মূল শিল্প ব'লে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সৌখীন শিল্পকে সেখানে প্রধান আসন দেওয়া হয় না।

শিশুর মানসিক বিকাশ—
বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের অর্থ

শিশুমনের বিকাশের পক্ষে কাজের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কাজের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য শিক্ষায় অগ্রসর দেশের লোকরা স্বীকার করেন। এই দিক থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা যে কাজের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ নির্বাচন করা হয়, সে সম্বন্ধে জনসাধারণ, এমন কি বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদ্‌দের মনেও একান্ত ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাছাড়া আমাদের দেশে এখনও, অন্যান্য দেশে বহুদিন পরিত্যক্ত মুখস্থ করাকেই বিদ্যালয়ের মুখ্য লক্ষ্য বলে চিন্তা করার ব্যবস্থা রয়ে গেছে। হঠাৎ এই ব্যবস্থার ব্যতি-ক্রমকে আমরা সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারি না। সর্বোপরি আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সাধারণের জন্য নয়—বিশেষ শ্রেণীর জন্য। এই বিশেষ শ্রেণীর কৌলীন্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কাজ—বিশেষতঃ কঠিন পরিশ্রমসাধ্য দৈহিক কাজ—না করা। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নির্বাচিত কাজের প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ বিতৃষ্ণার ভাব দেখা যাচ্ছে। এই সকল কারণে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধৈর্য্যের সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারছি না। এ প্রবন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষায় কি কি কাজ কেন নির্বাচন করা হয় এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পথে শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজগুলির মূল্য কতখানি সে সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যে মনোবিজ্ঞানসম্মত একথা আজকাল আর কেউ অস্বীকার করেন না। আমাদের দেশে শিশুরা আজও ধ্যানী বকের মত শ্রেণীতে বসে থাকে এবং শিক্ষক জীর্ণ-অজীর্ণ, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য তথ্য পরিবেশন করে যান সত্য; কিন্তু এটা যে একান্ত অকেজো রীতি, সেটা শিক্ষায় অগ্রসর সকল দেশই উপলব্ধি করেছে। মানুষের ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকে যদি আমরা উল্টে দেখি, তবে দেখতে পাবো যে, মানুষের ইতিহাসে তার শিল্পনিপুণতাই, তার জয়-যাত্রার সোপান রচনা করেছে। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র জীব যে তার হাতদুটোকে চলাফেরার কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তাদের শিল্প-সৃষ্টির কাজে লাগাতে পেরেছে। মানুষ তার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। নিদারুণ শীত আর হিংস্র জানোয়ারে ঘেরা নিষ্ঠুর পৃথিবী; তার মধ্যে মানুষ এসে যখন দাঁড়াল, তখন সে সর্ব কনিষ্ঠ, সবচাইতে দুর্বল। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে তখন সর্বক্ষণ যুদ্ধ করতে হয়েছে তার চাইতে শত শত গুণ শক্তিশালী হিংস্র জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচরদের সঙ্গে। ক্ষুদ্র মানুষের সহায় ছিল তখন শুধু তার দু'টি হাত আর সেই হাতকে বুদ্ধি-যুক্তভাবে কাজে লাগাবার উপযুক্ত বুদ্ধি আর ইচ্ছা। তাই দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে নূতন নূতন কৌশল, নূতন নূতন অস্ত্র। এই শিল্প-সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানুষ প্রস্তরযুগ পেরিয়ে ধাতুর সন্ধান করলে, নূতন নূতন অস্ত্রে সুরক্ষিত করল নিজকে, নব নব আচ্ছাদন তৈরী করে প্রকৃতির শীত গ্রীষ্মের খামখেয়ালী খেলার মধ্যেও টিকে রইল— অন্য সব প্রকাণ্ড জানোয়ারের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। বস্তুতঃপক্ষে, আদিমকালের এই মানুষদের সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জানি, কালের গর্ভে যতটুকু ইতিহাসের ইঙ্গিত তারা রেখে গেছে, তা চলাফেরার কাজ থেকে সদ্যমুক্ত বাহু দু'টির বিস্ময়কর শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন, এই নিদর্শন-

গুলি খুঁটিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই, কি করে তারা এগিয়ে গেছে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের দিকে, কি করে প্রত্যেকটি নূতন শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তারা উন্নত করেছে তাদের যন্ত্রপাতি, তাদের রচনা-কৌশল; কি করে ধাপে ধাপে নব নব সৃজনীক্ষমতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধারণা, পরিকল্পনা, প্রয়োগকৌশল প্রভৃতির বিকাশ সাধিত হয়েছে।

অন্যদিকে ইতিহাসের অঙ্কে অঙ্কে আমরা দেখতে পাই হৃতগৌরব জাতির সম্মানের আসন থেকে স্খলনের কাহিনী। সে কাহিনীর মূল কথা হচ্ছে জাতির সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ, কর্মের সঙ্গে চিন্তার অসহযোগ। গ্রীসের, রোমের, মোগলের ইতিহাসে আমাদের বক্তব্যের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য মিলবে। দুর্দান্ত জাত ছিল এরা, নিজেদের বাহুবল, নিজেদের কর্মশক্তির ওপর ছিল এদের অগাধ বিশ্বাস, দুর্বার গতিতে এরা দিগ্বিজয় করলে, নব নব আবিষ্কারে এরা দিল বিশ্বের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে। কিন্তু যখন কর্মের স্রোতে এলো ভাটা, নিজেদের বাহু দুটিকে বিশ্রাম দেবার আশায় যে দিন এরা ক্রীতদাসদের কাঁধের উপর ভর করল, বিলাসের প্রবাহে লাগল উজানের ধাক্কা—ভেসে গেল সরল জীবন, আত্মশক্তির উপর অকুণ্ঠ নির্ভর, সেদিন কাজকে এরা তুচ্ছ করল, রুদ্ধ হলো নূতন সৃষ্টির প্রেরণা—সঙ্গে সঙ্গে বিশাল রাজপাট, বিরাট অহঙ্কার মূহূর্তে শরতের ফেনশুভ্র মেঘের মত মিলিয়ে গেল।

প্রশ্ন ওঠে আজ যারা কাজ করছে—মেথর, কামার, মুচি, তাঁতি, চাষী—এদের মধ্যে বিকাশের লক্ষণ কই? এ হলো মরা গাঙ্গের আর এক তীর। বুদ্ধির সঙ্গে কাজের বিচ্ছেদ ঘটেছে এখানেও; তাই কাজ আর এগিয়ে চলছে না। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য কাজকে উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া, বুদ্ধিকে কর্মময় করে ফলপ্রসূ করে তোলা। বুদ্ধিহীন কাজ অন্ধ, আর কর্মহীন বুদ্ধি নিষ্ফল।

রাত্রেও গাছের পাতায় পত্রহরিৎ থাকে আর বাতাসে থাকে অঙ্গারাম্ল বাষ্প, কিন্তু গাছে পাতা থাকে ঘুমিয়ে, গাছের খাবার তৈরীর কাজ থাকে বন্ধ; ভোরের সূর্য্যালোকের সোণার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে, পাতা জেগে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, খাদ্যের ভাণ্ডার ভরে উঠতে থাকে। এমনি সম্পর্ক কাজ আর বুদ্ধির মধ্যে, জীবনের পটভূমিতে যতক্ষণ না এরা একীভূত হয় ততক্ষণ তারা থাকে বন্ধ্যা। আমাদের মধ্যে কাজের ভার যাদের ওপর তারা কাজ করে যন্ত্রের মত; চিন্তা করবার মত শিক্ষা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করে রেখেছি। ফলে মেথর পাঁচশ' বছর আগেও যেমন করে ময়লা পরিষ্কার করত, আজও তেমনি করেই কাজ করছে, তাতে প্রগতির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

কাজ আর চিন্তা আমাদের জীবনীশক্তির প্রকাশের দুইটি ধারা মাত্র। ব্যক্তি আর পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নিত্যই নানা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তাদের সমাধান চেষ্টা থেকেই চিন্তা, আর কাজ সেই চিন্তারই রূপায়ন। ক্রিয়াশীলতা মানুষের জীবনের লক্ষণ, এ আমাদের ভেতরকার শক্তির স্বপ্রকাশ। প্রকাশের পথ না পেলে এই শক্তি একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। কেটলীতে যখন জল ফুটতে থাকে তখন বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্য কোন না কোন পথ চাই-ই, যাতে কেটলীর ভেতর অতিরিক্ত চাপ না জমে ওঠে। পথ যদি না থাকে তবে বাষ্প বিপথেই পথ করে নেয়। আমাদের জীবনী-শক্তির বেলাতেও এটা সত্যি। স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির প্রাবল্যে শিশু ছটফট করে বেড়ায়। কেবলমাত্র চিন্তার মধ্য দিয়ে এই শক্তির সবটুকু ব্যয় করা শিশু কেন, যে কোন সাধারণ লোকের শক্তির সীমার বাইরে। সুতরাং, দৈহিক প্রকাশের সদর দরজা রুদ্ধ করে দিলে এ শক্তি খিড়কী দরজা দিয়ে গোপনে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর অধিকাংশ কুকাজের কারণ আমরা, বড়রাই সৃষ্টি করি শিশুর আত্মপ্রকাশের সহজ পথ রুদ্ধ

করে দিয়ে। সাধারণতঃ ধ্বংসাত্মক কাজ শিশু করতে চায় না, সৃষ্টির মধ্যে এরা অধিকতর আনন্দ পায়, এর মধ্য দিয়ে তাদের আত্মতৃপ্তির সুযোগ জোটে। নিজের ভেতরকার শক্তিকে রূপ দেবার পথ পেলেই শিশুর আগ্রহ জন্মে; এই আগ্রহই হচ্ছে সকল শিক্ষার মূল কথা। আগ্রহ যদি না থাকে তবে আমরা কোন জিনিষ শিখতে পারি না, আর যদিও শিখি, তবু আমরা তা সহজেই ভুলে যাই; কারণ, যাতে আমাদের আগ্রহ নাই, আমাদের অবচেতন মন তাকে ভুলে যেতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, যাতে আমাদের আগ্রহ নাই, তা যদি আমাদের জোর করে শেখানো হয়, তবে তার ওপর আমাদের একটা বিরাগ জন্মে এবং এই বিরাগ জন্মানোর ফলে এমন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যার জন্য একটা আকর্ষণীয় বস্তুও আমাদের কাছে একান্ত বিতৃষ্ণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্কে বিরাগ এই কারণজনিত। কেবলমাত্র সংখ্যা অথবা অঙ্ক শিশুর কাছে অর্থহীন। জোর করে শিশুকে মুখস্থ করতে দেওয়ার ফলে শিশু অঙ্কের প্রতি বীতরাগ হয়ে ওঠে এবং পরে চেষ্টা করেও অঙ্ক শিখতে পারে না। অথচ কাজ করতে গেলে হিসাব করা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদে শিশু সাগ্রহে অঙ্ক শিখে নেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, শিশু আজ কত তার সূতা কেটেছে, গত কাল থেকে আজ বেশী কেটেছে না কম কেটেছে, এটা ভাল করে জানার কৌতূহল তার খুবই বেশী। অথচ এই তথ্যটুকু জানবার জন্য সংখ্যা ও হিসাব জানা অপরিহার্য্য। অন্যদিকে যদি জোর করে এই কাজটাই শিশুকে দিয়ে করাতে হয় তবে ক্রমশঃ তার বিতৃষ্ণা বাড়বে এবং ফলে গুণতে বা হিসাব করতে শেখা তার পক্ষে কঠিনতর হয়ে উঠবে। এজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজই শিশুর প্রধান উৎস হওয়া উচিত।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত বলেও যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও প্রশ্ন করেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি শিল্পকার্য্য শেখান হয় কেন? তাঁরা বলেন যে, একটি শিল্পকর্ম্মকে কেন্দ্র করে সকল শিক্ষা দেওয়া চলে না এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি মাত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই অভিযোগ করা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই সমালোচনার কারণ। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নূতন শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা। এমন সমাজের নাগরিকই বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। যে সমাজ-ব্যবস্থায় শক্তি সংহত হয় একটি কেন্দ্রে, সে ব্যবস্থায় অসহায় পরনির্ভরতা অবশ্যম্ভাবী, সেখানে শোষণ থাকতে বাধ্য। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা শোষণহীন সমাজ গড়তে অক্ষম। আমাদের প্রত্যেকের ভোট দেবার অধিকার থাকতে পারে; কিন্তু যদি আর্থিক পরনির্ভরতা অনপসরণীয় হয় তবে সে অধিকার ব্যবহার করার নিরপেক্ষ সুযোগ জোটে না। সুতরাং, শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য কেবল রাজনৈতিক নয়, আর্থিক স্বাতন্ত্র্যও অপরিহার্য্য। কিন্তু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও পরিপূর্ণ স্বরাজ্য না থাকা সম্ভব যদি আমাদের নৈতিক স্বাধীনতাবোধ না থাকে। কোন দুইটি মানুষ একই রকমের নয়। মানুষের শক্তি ও প্রতিভার এই বৈচিত্র্য ও অসাম্য অনস্বীকার্য্য। যতই না কেন আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য নিরন্ধ্র মন্দির গড়ে তুলি, তাতে ছিদ্রপথ থাকবেই; বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা খুঁজে বের করতে পারবেনই কোন না কোন ফাঁক। এজন্য অসম মানুষের সমাজে যদি সাম্য-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হয় তবে কেবলমাত্র প্রাচীর গড়ে বিপদের আশঙ্কাকে এড়াবার চেষ্টা করলে চলবে না। চাঁদ সওদাগরের লোহার

মন্দিরেও কালনাগের ঢোকার মত ফাঁক থাকে। এমনি বিপদ এড়াতে গেলে প্রয়োজন হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের। সুতরাং, এ আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন এমন শিক্ষার, যে শিক্ষা পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করাকে ঘৃণা করতে শেখাবে, যে শিক্ষা শেখাবে শ্রমকে মর্য্যাদা দিতে, নিজে উৎপাদন করে অন্নগ্রহণ করাকে সম্মান করতে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় সেজন্য এমন কাজ বেছে নেওয়া হয়, যাতে শিশুকে নিজের জীবনের অপরিহার্য্য কাজগুলির জন্য অন্যের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হতে না হয়, যাতে নিজের জীবননির্ব্বাহের জন্য সে যেন না কখনো পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। আমাদের জীবনের তিনটি অপরিহার্য্য জিনিষ হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। শিশুকে যদি শোষণকে ঘৃণা করতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরোপজীবী হয়ে না থাকার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হয় তবে এই তিনটি বিষয়ে তার স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই তিনটি মূল কাজকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত রূপ নেবে ঃ অন্ন ঃ (ক) খাদ্য উৎপাদন, (খ) খাদ্য সংরক্ষণ, (গ) রন্ধন, (ঘ) বণ্টন, (ঙ ভোজন। বস্ত্র ঃ (ক) তুলা উৎপাদন, (খ) সূতাকাটা, (গ) বস্ত্রবয়ন, (ঘ) রঞ্জন ; বাসস্থান ঃ (১) সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণ, (১) বাসস্থান রচনা। এই কাজগুলির মধ্যে প্রথম চার শ্রেণীতে বাগানের কাজ ও খাদ্য সম্পর্কিত অন্য কাজগুলি, সূতাকাটা এবং সরঞ্জাম তৈরীর সহজ কাজগুলি আবশ্যিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণীতে কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জন এবং সরঞ্জাম তৈরীর কঠিনতর কাজের মধ্যে যে-কোন একটিকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। জীবনের বুনিয়াদ এই ত্রিবিধ কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এই কাজগুলিকে বেছে নেওয়া হয়—কেবলমাত্র কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে বলেই নয়। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন—কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি কাজ তো শিক্ষার মাধ্যম

হবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত তবে তেমন কাজ নেওয়া হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে উপরেই দেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্য কাজ বেছে নেবার মানে হচ্ছে জীবনে সেই কাজের অপরিহার্য্যতা। তবে জীবনের পক্ষে যে সকল কাজ অপরিহার্য্য সেগুলির ব্যাপ্তিও অসাধারণ এবং অন্যান্য শিল্প সে সব কাজের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকে। সুতরাং, কাঠের কাজ চামড়ার কাজ ইত্যাদিকে মূল শিল্প হিসাবে না নিলেও বস্ত্র বয়ন বা কৃষির কাজ শিখতে গেলে কাঠ ও ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদি আপনি এসে যায়, সরঞ্জাম রচনার বেলাতে তো আসেই। অন্নবস্ত্র হলো শিল্পজগতে সূর্য্যের মত। অন্যান্য কুটিরশিল্পগুলি এই মূল কাজগুলিকে কেন্দ্র করে চিরকালই ঘোরাঘুরি করছে।

কিন্তু যদিচ উপরোল্লিখিত তিনটি কাজ জৈবজীবনের জন্য পর্য্যাপ্ত তবুও মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিক থেকে এ তিনটি কাজ মাত্র শেখা যথেষ্ট নয়। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান হলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবলমাত্র ওতে মানুষের মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আরো তিনটি কাজকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ কাজগুলি হচ্ছেঃ (ক) সাফাই, (খ) আরোগ্য, (গ) সমাজজীবন পরিচালনা। সাফাই বলতে বোঝা যায় কুশ্রীতাকে ধ্বংস করা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। আরোগ্য হচ্ছে রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার। সমাজজীবন পরিচালনার মধ্যে রয়েছে আত্মসংযম এবং সমবেতভাবে নিয়মানুবর্ত্তী হয়ে কাজ করা। "শুধু দুটি অন্ন খুটি" মানুষের জীবনের চরিতার্থতা আসে না। তার ভেতর যে বৃহত্ত্বের সংকেত রয়েছে তাকে সার্থক করতে হলে তাকে আত্ম-নিয়োগ করতে হয় পৃথিবীকে সুন্দরতর করে তোলার কাজে।

সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র একটি শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

দেওয়া হয়ে থাকে, এই অভিযোগ একান্তই ভিত্তিহীন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে (ক) সাফাই, (খ) আরোগ্য, (গ) সামাজিক কাজ, (ঘ) বাগানের কাজ ও খাদ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাজ, (ঙ) সূতা কাটা, (চ) সরঞ্জাম তৈরীর কাজ—এই ছয়টি কাজ আবশ্যিকভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এইসব কয়টি কাজই হয় শিশুর শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু এই কয়টি কাজের মাধ্যমেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সবটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, এ ধারণা করাও ঠিক হবে না। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষাদানের কেন্দ্র তিনটি—কাজ তার একটি কেন্দ্র মাত্র। অন্য দুটি কেন্দ্র হচ্ছে প্রকৃতি ও সমাজ। আমাদের জীবন অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহ সত্য, কিন্তু আমাদের কাজকে নিত্য প্রভাবিত করছে প্রকৃতি ও সমাজ। সুতরাং কাজকে ভাল করে বুঝতে হলে, কাজকে উন্নত করতে হলে, কাজের ধারাকে পরিবর্ত্তিত করতে গেলে প্রকৃতি আর সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের জন্যও এই পরিচয়ের প্রয়োজন অসামান্য। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার অজস্র সুযোগ শিশুকে দেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের পুঁথির মধ্য দিয়েই এই পরিচয় সাঙ্গ করা হয় না। শিশুকে নানাবিধ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উৎসব রচনা ও উদ্‌যাপন করতে দেওয়া হয় এবং এই কাজকে শিক্ষার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এরই মধ্য দিয়ে শিশু নিত্য ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে প্রকৃতির সঙ্গে, নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ পায় সামাজিক রীতিনীতি-উৎসব-গুলিকে, শ্রদ্ধা করতে শেখে বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে, নূতন করে ভেঙ্গে গড়তে শেখে প্রাণহীন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলগুলিকে। এভাবে বিভিন্ন-মুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে শিশুর শিক্ষা প্রাণময় হয়ে উঠে, শিশু অর্জ্জন করে সংস্কারমুক্ত সবল সচেতন ব্যক্তিত্ব, তার বুদ্ধি হয় আবছা কুয়াসা থেকে মুক্ত, হৃদয়ে দীপ্ত হয়ে ওঠে কল্যাণের মঙ্গলদীপ।

অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন যে, যে কাজ শিশু জীবনে কখনো করবে না তাকে সে কাজ শেখবার জন্য এতটা সময় বৃথা ব্যয় করা হয় কেন! বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিশু সূতাকাটা বা বস্ত্রবয়নের কাজকে মূল শিল্পরূপে গ্রহণ করে শিক্ষালাভ করল সে হয়ত উত্তরজীবনে সাংবাদিক বা বৈজ্ঞানিক হবে; তবে কেন তাকে এই শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে সময়ের বৃথা অপব্যবহার করা হবে। এই শ্রেণীর সমালোচকরা প্রস্তাব করেন যে, যে গ্রামে মুচি বেশী সেখানে মুচির কাজ, তাঁতীদের গ্রামে তাঁতের কাজ, কয়লার খনির পরিধির মধ্যে ঐ রকমের শিল্প কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হোক্।

এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। সর্ব্বপ্রথমে এটা বোঝা দরকার যে, বুনিয়াদী শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষা নয়। যে ছেলে উত্তর জীবনে মুচির কাজ করবে তাকে মুচি করে তৈরী করা অথবা তাঁতীর ছেলেকে তাঁতী করে গড়ে তোলা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য নয়, বরং মেথরের ঘরে জন্মালেই মেথরের কাজ করে সারাজীবন কাটাতে হবে, অন্য যোগ্যতা হাজার থাকলেও সে অন্য কাজ করার সুযোগ পাবে না, সমাজের এই অন্যায় ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। শিশু উত্তর-জীবনে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে সে দিকে লক্ষ্য রেখে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মূল শিল্প নির্ব্বাচন করা হয় না। কোন্ কাজে শিশুর স্বাভাবিক নিপুণতা আছে, কোন্ ক্ষেত্রে শিশু পূর্ণ আত্মবিকাশ করতে পারবে তা শিশুকালে স্থির করা অসম্ভব। ১৪।১৫ বছর বয়সের আগে স্বাভাবিক নিপুণতার স্পষ্টরূপ নির্ণয় করা কঠিন। বংশগত বৃত্তি গ্রহণ করতে শিশুকে বাধ্য করা একটা সামাজিক অত্যাচার মাত্র। আর যদিও বা শিশুকে বংশগত বৃত্তি করতে হয় তবে সে শিক্ষা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ স্থান তার নিজ গৃহ, বিদ্যালয় নয়। তবে এও মনে রাখা দরকার যে, স্থানীয় কুটিরশিল্পের শিক্ষাকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অবহেলা করা হয় না।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প কাজ নির্বাচন করা হয় সম্পূর্ণ অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে। প্রথমতঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য কতকগুলি সংবাদ মুখস্থ করান নয়, জ্ঞান অর্জ্জনের ক্ষমতা শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করা। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার এবং সক্ষম পরিচালনার মধ্য দিয়েই এই ক্ষমতা বিকশিত হয়, এ আজকাল শিক্ষামনোবিজ্ঞানের গৃহীত সত্য। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ নির্ব্বাচনের সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে শিশু স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞান অর্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ পায়। যে কাজগুলি জীবনযাত্রার পথে অপরিহার্য্য, যে কাজ আমাদের চার-পাশে সর্ব্বত্র এবং অবিরত সংঘটিত হচ্ছে—অন্ততঃ হওয়ার সুযোগ আছে —সে কাজে শিশুর নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করার সুযোগ সব চাইতে বেশী এবং তাতে তার আগ্রহও অপরিমেয়। এদিক থেকে সাফাই, আরোগ্য. সূতাকাটা, বাগানের কাজ ও সামাজিক কাজের সমকক্ষ অন্য কোন কাজ আছে কি! প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে এ সকল কাজের যোগ একান্ত ঘনিষ্ট এবং এ সকল কাজকে লক্ষ্য করার সুযোগও অন্তহীন। এ সকল কাজ করতে গিয়ে সময়ের অপব্যবহার করা হয়, এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকারীরা অবশ্য আশা করেন যে, শিশুরা কেবল যে বিদ্যালয়েই এ সকল কাজে নিপুণতা অর্জ্জন করবে তা নয়, উত্তর জীবনেও এই সকল কাজ নিজ হাতে করবে। এই যদি হয় তবে সমাজের চেহারা যাবে সম্পূর্ণ পাল্টে এবং প্রকৃত শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাটুনী বা তাঁতীর কাজ করে উত্তর জীবনে কেউ সাংবাদিক বা বৈজ্ঞানিক হতে চান তবে তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার কালটুকু ব্যর্থ হয়েছে, একথা বলা চলবে না ; কারণ, সে ক্ষেত্রে শিশু-কাল থেকে পর্য্যবেক্ষণ বা যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্য শিশুর কাজশিক্ষার নিপুণতা বেড়ে যাবে এবং নিজের হাতে কাজ করার

শিক্ষা থাকায় অন্ততঃ আত্ম-বিক্রয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ খোলা থাকবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প শেখানোটাই প্রধান কাজ নয়, প্রধান কাজ শিক্ষা। ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহারের দক্ষতা, চিন্তার প্রসার এবং ন্যায় ও স্বাধীনতার উপর দৃঢ় নৈতিক বিশ্বাসের ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র উত্তর কালে যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করুক না কেন, নিপুণতার ফলে সেই কাজ শেখা তার পক্ষে সহজ হবে এবং কোন কারণেই সে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা সকলের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা। এ শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্র, চাষী-তাঁতী, কেরানী-শিল্পী সকলকেই যেতে হবে। অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই শিক্ষাই হবে একমাত্র শিক্ষা। সুতরাং সকলেরই পক্ষে যে কাজগুলি অবশ্য করণীয়, দৈবজীবন ধারণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যে সকল কাজ করা অপরিহার্য্য, সে কাজগুলিই বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্বাচন করা হয়। শিশুর হাতে আজ আমরা যে খেলা বা কাজ দিয়ে থাকি, সেটা শিশু নিজে স্বেচ্ছায় বেছে নেয়, তা ভাবলে ভুল করা হবে। বাপ-মায়ের সামাজিক অবস্থার উপর শিশুর নির্ব্বাচন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শিশুকে যদি এই অসম ব্যবস্থার সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে খেলার মোটরগাড়ী চালান আর সুতাকাটার মধ্যে একটা কাজ বেছে নিতে দেওয়া হয় তবে সে কোন্‌টা বেছে নেবে বলা কঠিন। আমাদের ধারণা, পরের তৈরী খেলনা থেকে নিজে খেলনা তৈরী করা, ধ্বংসের কাজ থেকে সৃষ্টির কাজ তাকে বেশী আকর্ষণ করবে। এই অসম ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা যে পথ বেছে নিয়েছে, সে এক বিপ্লবাত্মক পথ। এতে কেবলমাত্র বুদ্ধির চাষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি; বুদ্ধির চাষ আমরা অনেক করেছি তার ফলে সমাজকে

এমন অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছি যে, হিংস্র স্বার্থপর সমাজকে মানুষের সমাজ বলতে লজ্জাবোধ হয়। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় বুদ্ধির সঙ্গে মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সুসভ্য অস্তিত্বের ফলে যা অপরিহার্য্য তা করার ভার এক একটা শ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা কেবল মাত্র ঐ শ্রেণীগুলির বিকাশের পথ রুদ্ধ করিনি, ওদের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে কাজের উৎকর্ষের এবং সমাজের ক্ষতি সাধন করেছি। এই সমাজ-বিপ্লবও বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির একটি মূল লক্ষ্য।

শিশুর মানসিক বিকাশ—
কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষায় কেন কাজকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয় এবং কোন্ কোন্ কাজ কি কারণে নির্ব্বাচন করা হয়, আমরা ইতি-পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এবারে আমরা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা বলতে কি বুঝা যায়, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করব।

বুনিয়াদী বিত্তালয়ে শিশু কি শিখে ?

এ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা এই যে, বুনিয়াদী বিত্তালয়ে শিশু কেবল মাত্র সূতা কাটতে, বাগানের কাজ করতে, খেলাধূলা করতে, আর ময়লা পরিষ্কার করতেই আসে—এ ছাড়া শিক্ষা বলতে যা বুঝা যায়, তা শেখানোর কোন ব্যবস্থাই বুনিয়াদী বিত্তালয়ে নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার এটাই বোধ হয় প্রধান কারণ। বস্তুতঃ অনেক অভিভাবক এ পর্য্যন্ত ভাবতেও- দ্বিধা করেন না যে, শিক্ষার নামে বুনিয়াদী বিত্তালয়ে শিক্ষক ছেলে মেয়েদের দিয়ে কঠিন এবং হীন শরীর-শ্রম করিয়ে নেন এবং শিশুর শ্রমের ফলটা ভোগ করে থাকেন। ফলে অনেকে একে 'exploitation of child labour' বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

বুনিয়াদী বিত্তালয়ে শরীর-শ্রম করান হয় একথা সত্য। যে শ্রম শিশু বুনিয়াদী বিত্তালয়ে করে তা নিছক খেলাধূলা নয়—উৎপাদনমূলক কাজ। এই উৎপাদনমূলক কাজ থেকে শিশু নিজের শিক্ষার ব্যয়ও যথাসম্ভব বহন করে; বিনা বেতনে, বিনা পরিশ্রমে ভিক্ষা

চেয়ে শিক্ষা নেয় না। বস্তুতঃ নিজের শ্রমে শিক্ষার ব্যয় বহন করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মমর্য্যাদা অর্জ্জনের শিক্ষাই গ্রহণ করে।

এই কাজ করানোর মধ্য দিয়ে শিশুকে খাটিয়ে নেওয়াই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য নয়; শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের পক্ষে এরকম কাজ করা অনুকূল, এ জন্যই তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়। শিশুর দৈহিক বিকাশের পক্ষে এই কাজের মূল্য কি তা আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করেছি; বর্ত্তমানে আমরা শিশুর মানসিক বিকাশে 'কাজ' কি ভাবে সাহায্য করে তা আলোচনা করব।

"আমি একটা কাজ শিখেছি"—এখানে 'শেখা' কথাটার মানে কি? কাজ শেখা বলতে আমরা প্রথমতঃ বুঝি, কাজটি করার নিপুণতা অর্জ্জন করা। যেমন সাঁতার শেখা মানে—জলে নেমে সাঁতার দিতে শেখা, কেবল সাঁতার সম্পর্কে বড় বড় ভাল পুঁথি পড়া নয়। লেখা-পড়া শেখা মানে লেখা ও পড়ার কাজ শেখা। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা শেখা মানে স্বাস্থ্যরক্ষার পুঁথি পড়া, ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শেখা মানে ঐ সব বিষয়ের বইগুলি আয়ত্ত করা—এই ঠিক করে বসে আছি। ফলে কাজগুলি শেখা হচ্ছে না এবং ঐ কারণে পড়াশুনা শেষ করে কাজ করার যোগ্যতা আমাদের জন্মাচ্ছে না। সেই জন্য পরীক্ষা পাশ করে অসহায় ভাবে বেকার অবস্থায় আমরা দিন কাটাই; পরের দুয়ারে চাকরী না জুটলে চোখে অন্ধকার দেখি। বি-এ. এম-এ পাশ করে কেবল মাত্র পুঁথি পড়ার ভারেই যে আমাদের এই দশা ঘটে, তা নয়; বিভিন্ন ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেও আমাদের এই দশা ঘটে। কারণ, আমাদের দেশের বিদ্যামন্দিরগুলিতে ব্যবহারিক শাস্ত্রগুলিকেও হাতে-কলমে কাজ করে আমরা স্বল্পই আয়ত্ত করি।

কাজে নিপুণতা অর্জ্জন করতে হলে কেবলমাত্র যন্ত্রবৎ দ্রুত কাজ

করার ক্ষমতা অর্জ্জন করাই যথেষ্ট নয়। আজন্ম কাজ করে করে অনেকেই এই যান্ত্রিক নিপুণতা অর্জ্জন করে। কিন্তু এই নিপুণতার পেছনে জ্ঞানের সক্রিয় সহায়তা না থাকায় এই নিপুণতা একটা সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, নূতন নূতন পথ কেটে এগিয়ে চলতে পারে না। আমাদের দেশে অনেক নিপুণ কারিগর আছেন, বহুকাল ধরে এক একটা বিশেষ শিল্পের চর্চ্চা করে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁরা এক-রকমের নিপুণতা অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু নূতন কিছুকে গ্রহণ করার, অনাবশ্যক কিছুকে ছেঁটে ফেলবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এঁরা যেন প্রাণহীন যন্ত্রের মত—এঁরা বাড়তে জানে না, গ্রহণ-বর্জ্জনের ক্ষমতা এঁদের নেই, এঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এঁদের নিজেদের শিক্ষার ও ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে না। এই সৃজনী-শক্তির, সংশ্লেষণ-শক্তির অভাব আমাদের দেশের বহু কুটির-শিল্পের অকাল-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।

কোন কাজে নিপুণতা অর্জ্জনের জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ কাজ সম্পর্কে ধারণা ও পরিকল্পনা, দ্বিতীয়তঃ কাজটীকে ভাল-ভাবে করবার মত সরঞ্জাম সৃষ্টি, সংগ্রহ ও মেরামত করা; তৃতীয়তঃ বুদ্ধিযুক্তভাবে সরঞ্জামগুলিকে ব্যবহার করে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা।

কাজে নিপুণতা অর্জ্জন করতে হলে, আদর্শের দিকে এগিয়ে যেতে হলে আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য্য। মনে করা যাক, আমি সূতা-কাটার নিপুণতা অর্জ্জন করতে চাই। যদি আমার ভাল সূতা সম্পর্কে ধারণা না থাকে,—কত দ্রুত আমার সূতা কাটতে পারা উচিত, সূতা কতটা শক্ত, কতখানি সমতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, তা যদি আমি না জানি, তবে দড়ির মত মোটা অথবা নিরতিশয় সূক্ষ্ম কতটা শক্তিহীন সূতা কেটে আমার সূতা কাটা শেখা হয়ে

গেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা অসম্ভব নয়। আবার ত্রিপুরার মোটা আঁশের তূলা নিয়ে ৬০।৭০ নম্বরের সূতা কাটতে গিয়ে গলদঘর্ম্ম হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে সিদ্ধান্ত করে বসতে পারি যে, সূতা-কাটা আমার কর্ম্ম নয়। সুতরাং নিষ্ফল পণ্ডশ্রম না করে আমরা যদি সার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতে চাই, তবে কাজের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যদি এ জ্ঞান আমাদের থাকে তবেই আমরা কোন্ জিনিষ দিয়ে কি তৈরী করব, কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া কেন এবং কিভাবে করব, কোন্ কোন্ পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে এবং তার ফলাফল কি হয়েছে—সুতরাং, কোন্‌টাই বা গ্রহণ করব আর কোন্‌টা বর্জ্জন করব, কোথায় ত্রুটী রয়েছে এবং কি ভাবে তা দূর করব—এসব কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারব। এর ফলে ব্যবস্থিতভাবে একটা পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে যাওয়া সম্ভব। পাল-তোলা নৌকা শুধু নদীবক্ষে ভাসিয়ে দিলেই চলেনা, গন্তব্য স্থানে পৌছাতে হলে একটা লক্ষ্য সামনে রেখে হাল ধরতে হয়। আদর্শ হল আমাদের গন্তব্যস্থল আর পরিকল্পনা হ'ল হাল। এই দু'য়ের কোন একটির অভাব ঘটলে পালছেঁড়া হাল-ভাঙ্গা নৌকা বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণাবর্ত্তে তলিয়ে যায়।

নিপুণতা অর্জ্জনের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরী, সংগ্রহ এবং মেরামত করতে পারা। এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। ছুরি দিয়ে স্ক্রু-ড্রাইভারের কাজ চালাতে গেলে কাজটা ভাল হয় না। সূতাকাটার জন্য বাঙ্গালীর ছেলে যদি আমেদাবাদের টেকোর উপর নির্ভর করে বসে থাকে, তবে তাকে পদে পদে বিপদে পড়তে হয়। চাষীকে যদি লাঙ্গল তৈরী বা মেরামত করবার জন্য বারবার সহরের ইঞ্জিনীয়ারের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটাছুটী করতে হয় তবে তার লাঞ্ছনারও সীমা থাকে না আর কাজটার পণ্ড

হবার সম্ভাবনাও থাকে আঠারো আনা। যে মোটর-চালক মোটর গাড়ী চালাতে জানে, কিন্তু কোন একটা যন্ত্র নষ্ট অথবা সাময়িক-ভাবে অকেজো হয়ে গেলে অসহায় হয়ে পড়ে, কোথায় দোষ ঘটেছে তা বুঝতে অক্ষম হয়, তাকে ভাল মোটর-চালক বলা চলে না এবং তেমন রথসারথীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুন বিপজ্জনক হতে পারে। আমাদের অনেক অসহায় অবস্থার কারণ কাজের এই দিকটায় নিপুণতার অভাব। গ্রামের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে আমরা যেন অতলে তলিয়ে যাই। সেখানে না মেলে হাতের কাছে যন্ত্রপাতি, না আছে ঘরের কাছে কোন ব্যবস্থা। সুতরাং হতাশ হয়ে, পুঁথি-পড়া বিদ্যা সকলের কাছে জাহির করে কেবল মাত্র অজ পাড়াগাঁ না হলে আমরা কি অসাধ্য সাধন করতে পারতাম তার ফিরিস্তি সকলকে দিয়ে আমরা দিন কাটিয়ে দেই। নিজের হাতে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার বা মেরামত করতে পারিনা বলেই আমাদের এই অবস্থা ঘটে, কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। মহাত্মা-জীর নোয়াখালী-পরিক্রমার সময়ের এ সম্পর্কিত একটা কাহিনী উল্লেখ-যোগ্য। নোয়াখালীতে জলের তো কোন অভাব নেই—চারদিকেই পুকুর আর ডোবা। কিন্তু পানায় ভরা দুর্গন্ধ পচা ডোবায় পানীয় জল অল্পই মিলে। অথচ এই জলই গ্রামবাসীরা পান করে আসছে চিরদিন; কিছু করা সম্ভব, কিছু করা তাদের সাধ্যায়ত্ত, একথা তারা ভাবেওনি কোনদিন। গান্ধীজী একদা সতীশ বাবুকে লক্ষ্য করে বলেন, কেমন তুমি বৈজ্ঞানিক আর কেমনই বা তোমার বিজ্ঞান যদি এই অসহ অবস্থা দূর করা সম্ভব না হয়! এর ফলে যে চিন্তা সুরু হল তার পরিণতি ঘটল পুকুরের জলকে অতি সহজে বিনা খরচায় নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও পানোপযোগী করে তোলার একটি অতি সহজ যন্ত্রের আবিষ্কারে। যন্ত্রের সরঞ্জাম কিছুই নয়—টিনের ক্যানেস্তারা, টিনের পাইপ ইত্যাদি একান্ত ঘরোয়া জিনিষ। এই কি বিজ্ঞান নয়? প্রচুর জোড়াতালি দেওয়া প্রকাণ্ড

যন্ত্রগুলিকেই আমরা বিজ্ঞানের তপশ্চর্য্যার বিস্ময়কর পরিণতি বলে জেনেছি, অথচ আমাদের চারপাশে যে প্রচুর উপকরণ ছড়ান আছে তাকে ব্যবহার করে আমরা প্রয়োজন মিটাবার শিক্ষা পাইনি, তাকে বিজ্ঞান বলে চিনতে শিখিনি। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই সৃজন-ক্ষমতার অভাবেই আমাদের সকল প্রগতি ব্যাহত হয়ে আছে।

কেবলমাত্র পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া সম্পর্কে খুঁটিনাটি আক্ষরিক জ্ঞান থাকলেই কাজে নিপুণতা আসে না। প্রচুর যন্ত্রপাতি থাকলেও তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারা কিছু আশ্চর্য্য নয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মত ব্যবহারিক যোগ্যতা থাকা কাজে নিপুণতা অর্জ্জনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এ সম্পর্কে আমার নিজেরই একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন সেবাগ্রামে শান্তা দেবীর কুটিরে থাকতাম। একদিন রান্না করার ভার পড়ল আমার উপর। উনুন, কাঠের কুচি, আগুনে ফুঁ দেবার চোঙা—সবই প্রস্তুত, রান্নার সরঞ্জাম ত সব কিছুই আমার কাছে হাজির। ঐ ঘরে বসেই ঐসব জিনিষ-পত্র নিয়ে এর আগে প্রতিদিন শান্তাদিকে রান্না কোর্ত্তে দেখেছি। কতখানি জলে কতখানি চাল দিলে কত সময়ে কি রকম আঁচে ভাল ভাবে রান্না হওয়া উচিত, তাও আমার জানা। কিন্তু গোল বাধল প্রথমেই আগুন জ্বালতে গিয়ে। বাঁশের চোঙা দিয়ে শুকনো কাঠের কুচিতে যতই ফুঁ দিচ্ছি ততই আগুন না জ্বলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল, কিন্তু উনুন আর ভাল করে জ্বলে না। ধোঁয়ার উপদ্রবে পাশের ঘর থেকে শান্তাদি এলেন। দেখা গেল, উনুনে অক্সিজেন ঢোকার পথটুকু আমি মোটেই ভাল করে রাখিনি। একটা কাঠ আড় করে উনুনের মুখে দেওয়া মাত্র উনুন জ্বলে উঠল। অথচ দহন-কাজে যে অক্সিজেনের সাহায্যের প্রায়োজন ভাল করেই তা আমার জানা ছিল। এ নিয়ে দু'চার

গণ্ডা বক্তৃতাও যে জায়গায় জায়গায় দেইনি, এমন নয়। আমাদের মত পণ্ডিত-মূর্খদের জীবনে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই—এখানে যে পরিকল্পনার অভাব ছিল, তাও নয়। আর সরঞ্জামেরও তো কোন অভাব ছিলই না, অভাব ছিল বুদ্ধিকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগের। শিক্ষার এই অভাবটা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করা ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী।

কাজ শিখতে গিয়ে শিশু এই ত্রিবিধ নিপুণতাই অর্জ্জন করবে এবং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ভাবে এগিয়ে যেতে পারবে, এই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্য। সাধারণের মনে প্রশ্নও এইখানেই। এর মধ্যে লেখাপড়া, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির স্থান কোথায়, এইটাই তাঁরা স্পষ্ট করে জানতে চান।

আজকাল বিদ্যালয়ের যে কার্য্যসূচী আমরা দেখতে পাই তাতে বিদ্যালয়ের সময়টা ৪০, ৪৫ বা ৫০ মিনিটের কতকগুলি ভাগে ভাগ করা থাকে। এই বিভিন্ন সময়ে ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ে অবশ্য কার্য্যসূচীর মধ্যে সঙ্গীত, চিত্রকলা, শরীর-চর্চ্চা ইত্যাদির জন্যও কিছু কিছু সময় রাখা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচী কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম ; তাতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সময় রাখা হয়ে থাকে : (১) ঘর-দোর এবং জিনিষপত্রাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করার সময়, (২) শিল্প-কাজের সময় : (ক) সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন, (খ) বাগানের ও কৃষিকাজ, (গ) অন্য কোন উপযুক্ত স্থানীয় শিল্প, (৩) প্রার্থনার সময়, (৪) হিসাব করার সময়, (৫) আলোচনার সময়, (৬) খেলাধূলার সময়, (৭) শিশুদের খুসী মত কাজ করার জন্য খানিকটা সময়। স্থান, কাল, কাজের পরিমাণ ও শিশুর বয়স অনুসারে বিভিন্ন কাজের জন্য সময় রাখা হয়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরিবর্ত্তন হয়, এমন কি প্রয়োজন অনুসারে

সপ্তাহের মধ্যে মধ্যেও কাজের সময় পরিবর্ত্তিত হয়। বাগানের জন্য যখন জমি তৈরী করতে হয় তখন বাগানের কাজে অনেকটা সময় দিতে হয়। আবার বীজ বোনার পর কয়দিন কোন কাজ থাকে না, তখন বাগানের কাজের সময়টা অন্য কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়— অলসভাবে সময় ফেলে রাখা হয় না। এসব নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছাড়া কিছু কিছু বিশেষ কাজও থাকে। যেমন প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার দিনটি গান্ধী-স্মৃতি দিবস রূপে প্রতিপালিত হয়। সেদিন প্রার্থনার সময় দীর্ঘতর হয়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, সূতা কাটার সময় বেড়ে যায়, সূতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী-জীর গল্প চলতে থাকে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন সমস্ত সপ্তাহের কাজের হিসাব হয় ও পরবর্ত্তী সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সেদিন সূতাকাটার জন্য সময় একটু কম পাওয়া যায়, সাধারণ আলোচনার সময় বড় একটা থাকে না। মাসের প্রথমে এমনি করে গত মাসের কাজের হিসাব-নিকাশ করে নেওয়া হয়। সপ্তাহে হয়ত একদিন বা দু'দিন ঘর লেপা হয়, ২।৩ দিন বেড়াতে যাবার জন্য সময় রাখা হয়। তা'ছাড়া ঋতু-উৎসব, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উৎসব, মহা-পুরুষদের স্মৃতি উৎসব আছে। একেও শিক্ষার অঙ্গ বলে ধরা হয় এবং এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বিদ্যালয়ে নিয়মিত সময় রাখা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথমোক্ত কার্য্যসূচী বিষয়-কেন্দ্রিক, দ্বিতীয়োক্ত কার্য্যসূচী কর্ম্ম-কেন্দ্রিক। এখন প্রশ্ন এই যে, এই কর্ম্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায়?

প্রথমে দেখা যাক, সাধারণ বিদ্যালয়ে যে আলাদা আলাদা বিষয়গুলি শেখান যায়, তাতে শিশু শিখে কতখানি এবং তাতে তার লাভই বা হয় কতটুকু। এ কথা হয়ত সকলেই স্বীকার করবেন যে, জগতে বিভিন্ন বিষয়গুলির বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা কোথাও নেই। বিষয়-বিজ্ঞান বয়স্ক মনের

পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তির বিশ্লেষণী-ক্ষমতার প্রয়োগের ফল। আমি যখন বলি, "আমার বাড়ী শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত পৈল নামক গ্রামে, গ্রামটী এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত" অথবা "আমার বয়স ৩৭ বৎসর চলছে"—তখন আমি বাংলা সাহিত্য বলছি না ভূগোল বলছি না অঙ্কের কথা বলছি, তা বলা কঠিন। অথচ এর মধ্যে সবগুলি জিনিষই আছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে দেখার উপায় মাত্র। তা বলে এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, তা বলছি না। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার যে আজ এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে যে অজস্র গবেষণা সম্ভবপর হচ্ছে তার প্রধান কারণ এই যে, সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে মানুষ নিজের জ্ঞানানুসন্ধানের গণ্ডী টান্‌তে শিখেছে এবং সেই গণ্ডীর মধ্যে কি ভাবে অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হতে হয়, তার কৌশল আয়ত্ত করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের কথা কেন, একটি মাত্র বিজ্ঞানের মধ্যকারই বিভিন্ন শাখার কথা ধরা যাক। রসায়নের সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতির অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। কিন্তু সেজন্য যদি কেউ রসায়ন-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে গিয়ে প্রথমে পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হতে চান, তা হলে তাঁর রসায়ন-শাস্ত্রে অগ্রগতি নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু আমাদের প্রশ্ন শিশুর নিকট সে প্রয়োজন আছে কি? রসায়নে বিশেষজ্ঞ হ'লে অঙ্ক শেখারও প্রয়োজন আছে—তবে যতটুকু রসায়ন-শাস্ত্র বোঝার জন্য প্রয়োজন ততটুকু শিখলেই যথেষ্ট। সুতরাং রসায়ন ও অঙ্ক বিচ্ছিন্ন পদার্থ নয়, যদিও স্পষ্টতঃই বিভিন্নতা আছে; অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়গুলি বিচিত্র হলেও তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। এক কথায় বলা যায় যে, কাজের সুবিধার জন্য বিষয়গুলি আলাদা আলাদা করার

প্রয়োজন আছে ; কিন্তু যদি বিভিন্নতাকেই চরম সত্য বলে মনে করা হয় তবে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায় অনেকখানি। ১১।১২ বৎসরের আগে শিশুর কাছে বিভিন্ন বিষয়গুলির আলাদা কোন অর্থই থাকে না, শিশুর কাছে সাহিত্যের বই আর ভূগোলের বইতে তফাৎ অল্পই। দুটোই তার কাছে বই, দুটোই বাংলা ভাষায় লেখা এবং দুটোই মুখস্থ করে মাষ্টার মশাইর কাছে পড়া দিতে হয়। সাহিত্যের বইএ যদি কোন দেশের ম্যাপওয়ালা একটা আখ্যান জুড়ে দেওয়া হয় কিংবা গণিতের বইএ যদি খনার ছড়া থাকে, অথবা ভূগোলের বইএ যদি "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানটি বসিয়ে দেওয়া হয় তবে তাতে শিশুর কোন অসুবিধা হয় না।

এটাতো গেল শিশুকে বিষয়গত ভাবে শিক্ষা দেবার দার্শনিক অসুবিধা। এ ছাড়া একটা খুব বড় রকমের ব্যবহারিক অসুবিধাও আছে। ঘণ্টা বেঁধে শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাটা একান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ে। শিশু বয়স্কদের মত ঘড়ি ধরে কর্ত্তব্যের পথ বেয়ে দম ধরে এগিয়ে চলে না। তার অগ্রগতির জন্য প্রচুর পরিসরের প্রয়োজন। বই পড়া শিশুর কাছে যতখানি কর্ত্তব্য, খেলাটা তার পক্ষে কোন অংশে তার চাইতে কম প্রয়োজন নয়। সুতরাং কর্ত্তব্যের খাতিরে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোসংযোগ করতে হবে, এই ব্যাপারটা সে আদৌ বুঝতে পারে না। শিশু অঙ্কের ঘণ্টায় অঙ্কের প্রতি মনোযোগ ছিল না বলে শিক্ষক মশাই যখন তাঁর নির্ম্মম বেত অপ্রতিহতগতিতে চালিয়ে যান তখন অসহায় শিশু এই অর্থহীন দণ্ডের অর্থ কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষাদাতার প্রতিও একটা ঘৃণার বীজ শিশুমনে অঙ্কুরিত হতে থাকে।

অন্যদিকে ঘণ্টাগুলিকে যে ভাবে ভাগ করা হয়, তাতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোসংযোগ করা মনের সাধারণ গতির দিক থেকেও

অসম্ভব। কার্য্যসূচী তৈরী করা হয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে, শিশুদের দিকে চেয়ে নয়। সমগ্র বিদ্যালয়ে হয়ত একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক কিংবা দুইজন গণিতের শিক্ষক আছেন। কিভাবে তাঁদের মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে সব শ্রেণীতে পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই হয়ে দাঁড়ায় কার্য্যসূচী-তৈরী করার সময় প্রধান মানসিক কসরৎ। ফলে হয়ত অঙ্কের শ্রেণীর পর চিত্রকলার শ্রেণী পড়ল। যে ছেলে অঙ্ক ভালবাসে সে হয়ত একটা অঙ্কের সমস্যার মধ্যে যেমনি রস পেতে সুরু করেছে অমনি ঘণ্টা বেজে গেল। অঙ্কের বই ফেলে এবার বসতে হবে ড্রইংএর খাতা নিয়ে। যদিও ড্রইংএ মন বসছে না তবুও অঙ্কের খাতা খোলার উপায় নাই। দুলতে দুলতে যেমনি হয়ত ছবি আঁকার দিকে মনটা ঝুঁকল অমনি বাজল আবার ঘণ্টা। সুতরাং অঙ্কও হলনা আর না হল চিত্রকলা—কপালে জুটল অনাবশ্যক বকুনী, মনটা ভরে উঠল অকারণ তিক্ততায়। এমনি ভাবে কার্য্যসূচী ভাগ করা এবং সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে কোন কাজটাই ঠিক করে করা হয়ে ওঠে না। মাঝখান থেকে একটা না একটা বিষয় শিশুর দু'চোখের বিষ হয়ে উঠে।

সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে ঘণ্টা বাজিয়ে বিভিন্ন বিষয় পড়ান হয় না তার পেছনে যুক্তি পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখাবার সুযোগ সেখানে কোথায়?

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিষয়গতভাবে আলাদা আলাদা করে ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শেখানো হয় না বটে তবে প্রথম থেকে শিশুরা যাতে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে, প্রত্যেকটি কাজের সঠিক হিসাব রাখতে পারে, প্রত্যেকটি কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝে তা দূর করতে পারে এবং কাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মূল্য বুঝতে

পারে—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় ; সুতরাং, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কাজ। যা কিছু জানলে কাজটি ভাল ভাবে, উন্নততর ভাবে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করা যায় এবং শিশু নিজের অধীত বিদ্যা পরের কাছে সাবলীল ভাষায়, সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারে, সে সকল তথ্যই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুকে পরিবেশন করা হয়।
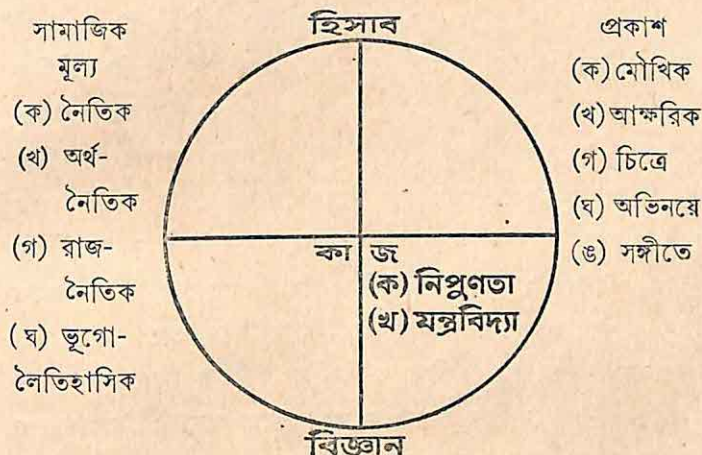
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ শেখা মানে কেবল মাত্র যান্ত্রিক নিপুণতা অর্জ্জন করা নয়, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। যান্ত্রিক নিপুণতা শিক্ষার একটা মুখ্য দিক মাত্র, সবটুকু নয়। শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য শিশুকে আত্মপ্রকাশ করতে শিখতে হয়। প্রত্যেকটি কাজের পেছনে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সত্যের প্রয়োগ রয়েছে তা বুঝতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রয়োগে কোথায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা বুঝে নিজের কাজকে উন্নততর করার শিক্ষা নিতে হয় ; প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মূল্য বুঝতে হয় এবং কোন কাজ কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত তা ভাল ভাবে বুঝে সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করতে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার এই চারিটি দিক সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক ঃ

প্রকাশ ঃ

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথমাবধি বিশেষভাবে শিশুর আত্মপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। শিশুর হাতে এখানে প্রথমে কোন বই দেওয়া হয় না। নানাবিধ খেলা-ধূলা, গান, চিত্রাঙ্কনই হয় শিশুর প্রধান কাজ। কিন্তু দিনান্তে শিশুকে সারাদিনের কাজের একটা মৌখিক বিবরণ দিতে হয়। এই সমস্তের মাঝখান দিয়েই শিশু অবাধ আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পায়। শিক্ষক শুধু এইটুকুই দেখেন যে, শিশু যেন নিজের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে অপরের কোন ক্ষতি না করে বা নিজে কোন বিশেষ বিপদের সম্মুখীন না হয়। এই বয়সে শিশুর খুশীমত আঁকার মধ্য দিয়েই লিখিত ভাষা শিখার পূর্ব্ব-প্রস্তুতি চলতে থাকে। পরে অন্য এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। সঙ্গীত ও দৈনিক কাজের বিবরণী দেওয়ার মধ্য দিয়ে শিশু মৌখিক ভাষা আয়ত্ত করতে থাকে। প্রার্থনা ও কাজকে আনন্দদায়ক করার জন্য গানের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন টাকুতে একটি বিশেষ আসনে সূতা কাটার সময় গান করা হয় ঃ

ঝট্‌কা লপেট আর তলোয়া কাতাই
তকলীর ছন্দেতে মোরা গান গাই।

অথবা চরকায় সূতা কাটার সময় ঃ

শান্ত মনে চল চরকা চালাই
দুঃখ করিতে দূর জগতের ভাই।
পথে পথে ভাই বোন কাঁদিতেছে ঐ শোন,
পরণে কাপড় আর পেটে ভাত নাই।

বিভিন্ন কাজের জন্য এরকম প্রচুর গান রয়েছে, প্রয়োজন পড়লে শিক্ষক স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী আরো গান তৈরী করে নেন। এই সকল

গান গাইতে গাইতে শিশু যখন কাজ করে তখন তার কাজের বোঝার দিকটা লঘু হয়ে যায়, আর গানের ছন্দে ছন্দে কাজের নিপুণতা বেড়ে উঠতে থাকে। এই ভাবে গানের রসবোধ শিশুর মধ্যে জাগ্রত হয়। অন্য দিকে গানের মধ্য দিয়ে শিশুর নূতন নূতন শব্দের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকে ; বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নাম, বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম, ব্যবহার ইত্যাদি সে শিখতে থাকে। এ ছাড়া অবশ্য শিশুর প্রার্থনা এবং নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য শিশু বিবিধ গান, কবিতা ইত্যাদি শিখে থাকে। এই সকল গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যাতে বিশেষভাবে সু-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে সে দিকে শিক্ষক বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। মৌখিক প্রকাশের জন্য অবশ্য প্রথমে সব চাইতে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় দিনান্তে শিশুর দিনের কাজের বিবরণ দেওয়ার দিকে। শিক্ষক নিজেও সারাদিনের কাজের বিবরণ দেন। তাঁর এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে শিশু নূতন নূতন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়, প্রত্যেকটি শব্দের সুস্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ জানে। শিশু বিবরণ দেবার সময় যাতে সাবলীল ভাষায়, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে, ধারাবাহিক ভাবে কাজের বিবরণ দিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

প্রথম প্রথম শিশু ভুল ভাষা ব্যবহার করে, ভুল শব্দ প্রয়োগ ও ভুল ক্রিয়াপদ থাকে অজস্র। ক্রমে শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে দেখে নূতন নূতন শব্দ প্রয়োগ, এমন কি বিভিন্ন অলঙ্কারের প্রয়োগও করতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে শিক্ষকের বিবৃতিই হয় আদর্শ। তাঁর ভাষা যত সমৃদ্ধ হয় শিশুর ভাষাও ততই সরস হয়ে উঠতে থাকে। এ দিক থেকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা অত্যন্ত বেশীভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। শিক্ষকও অবশ্য ভাষা শিক্ষার অনুপূরক হিসাবে বিভিন্ন কাজ, উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে সু-সাহিত্যিকদের লেখা থেকেও প্রচুর পরিবেশনের সুযোগ পান। শিশুর শিক্ষার দিক থেকে এই প্রথম

১।২ বৎসরের দাম খুব বেশী। শিক্ষকের ভুল উচ্চারণ, শব্দের অপ-প্রয়োগ, ভাষার বিশুদ্ধতার অভাব শিশুর যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। এ সময়ে দিনান্তে সারাদিনের কাজের বিবরণ দেওয়াই হয় শিশুর প্রধান পাঠ। প্রথমে শিশু ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারে না, দু'টো চারটে ঘটনা এলোমেলো ভাবে মনে রাখতে পারে মাত্র। ক্রমে শিশুর ধারাবাহিক ভাবে কাজগুলির কথা মনে রাখার ক্ষমতা জন্মে ও বিভিন্ন কাজগুলিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি হয়। এটাই হয় তার স্মৃতিশক্তির প্রাথমিক অভ্যাস।

প্রথম বৎসরের শেষ দিকে অথবা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে শিশু লিখতে শিখতে আরম্ভ করে। এখানে সুরু হয় তার শিক্ষার দ্বিতীয় পর্য্যায়। কি করে লেখা-পড়া শেখার কাজ এগিয়ে চলে এ সম্পর্কে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবার শিশু সারাদিনের কাজের বিবরণ লিখে রাখতে শেখে ও বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে যা শেখে তা লিখে রাখে। এবার শিক্ষকের কাজ হয় তাদের লেখা সযত্নে শুদ্ধ করে দেওয়া। এই হয় শিশুর প্রধান পাঠ্য পুঁথি। শিশু নিজের লেখা নিজে পড়ে শোনায়। এতে আত্মপ্রকাশের প্রচুর আনন্দ সে পেয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যথাস্থানে উপযুক্ত জোর দিয়ে তারা পড়তে শেখে। সারাদিনে লেখার কাজ বড় কম হয় না, আর সবটাই হয় নিজের আত্মপ্রকাশ।

এই ভাবে ভাষা শেখার সঙ্গে আমাদের চলতি বিদ্যালয়ের ভাষা শেখার প্রভেদ সুস্পষ্ট। চলতি ভাষা শিক্ষার অল্পই শিশুর নিজের আত্মপ্রকাশ। শিক্ষকের আদেশে শিশু কতকগুলি পাঠ্য মুখস্ত করে এবং পরীক্ষার খাতায় সেই গুলিই আবার পরের ভাষায় উদ্গীরণ করতে শেখে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর রস গ্রহণ বা তাকে আত্মস্থ করার ওপর অল্পই জোর দেওয়া হয়। বিশেষতঃ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে

শিশুর নিজের জীবনের উন্নতির যোগ অল্পই থাকে। এখানে বড়দের কাছে বিষয়বস্তুর মাধুর্য্য বা ওই সব নীতিবাক্য শেখার ঔচিত্য যতই হোক না কেন শিশুর জীবনের জমিতে তার মূলের প্রসার ভাল হয় না। ভাল হজম করার জন্য যেমন লালা নিঃসরণের প্রয়োজন অনেকখানি, শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হলেও তেমনি আগ্রহের লালা নিঃসরণের প্রয়োজন। এ আগ্রহ সৃষ্টি কেবল মাত্র ঔচিত্য বোধ থেকে হয় না। তার জন্য প্রয়োজন জীবনের নানা interest-এর সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ। চলতি শিক্ষায় তার সুযোগ অল্পই থাকে। এজন্য আমরা দেখি যে, ছাত্ররা আজকাল মূল গ্রন্থ অল্পই পড়ে থাকে; নোট বই মুখস্ত করে পরীক্ষার জন্য তৈরী হয়। ফলে সুসাহিত্যের বদলে অতি নীচু স্তরের ভাষার সাথে তাদের পরিচয় ঘটে এবং নিজের চেষ্টায় নিজের ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। বি, এ; এম, এ পাশ করেও যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা দুটো বাক্য শুদ্ধ করে লিখতে পারেনা তার কারণ এইখানে। কেবল মাত্র নোট বই আর কপালের জোরে অনেক বিদ্যার্থী উত্তরে যায়। মুখস্থের মধ্য থেকে পড়লে নম্বর কাটার কোন উপায় থাকেনা। অথচ একটু আধটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন এলেই জারিজুরী ধরা পড়ে যায়। এমনও অনেক ক্ষেত্র জানি, যেখানে প্রশ্ন না বুঝার ফলে পরীক্ষার্থী এমন উত্তর মুখস্থ লিখে দিয়ে এসেছে যার সঙ্গে প্রশ্নের কোন যোগই নাই। বইয়ের 'ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট" অংশটুকু ছাড়া যে কেউ বড় অন্য কোন অংশ পড়ে না, ব্যাখ্যাদি যে কখনও নিজের ভাষায় লেখেনা তা তো আমরা সকলেই জানি। স্বাধীনতা লাভের পর বর্দ্ধমান জেলার মেমারীতে এক কর্ম্মী সম্মেলন হয়। সেখানে কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, যতদিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাতে সব পরীক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারেন

ততদিন পরীক্ষা বন্ধ থাকুক। উত্তরে উদ্বিগ্ন অধ্যাপকগণের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সর্ব্বনাশ, তা হলে তো ছেলেমেয়েরা সব ফেল করবে। ওরা ইংরেজীতে প্রশ্নের উত্তর শিখেছে বাংলায় উত্তর লিখবে কি করে! আমরা আজকাল বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ ভাষা শিখে থাকি এই তার পরিণাম! সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষা কিছু মাত্র হচ্ছেনা জেনেও অধ্যাপকরা এমন শিক্ষাই এখনও দিয়ে চলেছেন এবং অভিভাবকরা পর্য্যন্ত পরীক্ষা পাশ আর চাকুরীর নেশায় নিজ সন্তানসন্ততির এই সর্ব্বনাশ সহ্য করছেন। বিদ্যার্থীদের কোন দোষ দেওয়া বৃথা। শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা এমনি যে, যে যত ভাল ভাবে ফাঁকি দিতে পারে, যে যত নিজের মৌলিক চিন্তা চেপে যেতে পারে পরীক্ষায় তারই তত জয়-জয়কার। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরের কথা কম মুখস্থ করতে হয় বলে নিজের ভাষাকে আয়ত্ত করার ও আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ বেশী জোটে।

অবশ্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বই দেওয়া হয় না বলে লোকের যে ধারণা আছে, সেটা একান্তই ভ্রান্ত। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বই দেওয়া হয় এবং সাধারণ বিদ্যালয় থেকে সেখানে শিশুরা অনেক বেশী বই পড়ে থাকে। কেবল এখানে পাঠ্য পুস্তকের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয় না। প্রথমতঃ শিশুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি সম্বন্ধে জানবার জন্য পুস্তকের সাহায্য নিতে হয়। উৎসবাদির জন্যও অনেক বইপত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদের ঘাঁটতে হয়। যে-কোন একটা উৎসবের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের জীবনী, কবিতা, গান নাটক ইত্যাদির সঙ্গে বিদ্যার্থীদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক বিদ্যার্থীদের কাছে বিভিন্ন বই পড়ে শোনান, বইএর কথা বলে দেন এবং তাদের বইগুলি পড়ে নিতে বলেন। এমনি করে

উৎসবাদির মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট লোকদের লেখার সঙ্গে বিদ্যার্থীদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু এখানে বিশেষ বই পড়া, বিশেষ ব্যাখ্যা মুখস্থ করাই প্রধান হয় না, পুস্তকের সঙ্গে পরিচয়ই প্রধান হয়। বইএর ভাষায় উত্তর লেখার উপর কোন জোর দেওয়া হয় না; দেখা হয় যে, বিদ্যার্থী বই পড়ে সমস্যাকে আয়ত্ত করার ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে। কতগুলি পাঠ্যপুস্তক আয়ত্ত করায় মধ্যে শিশুর সর্ব্বশক্তিকে নিবদ্ধ করার বদলে সমগ্র গ্রন্থাগারকে শিশুর সামনে খুলে ধরা হয়, পুস্তকের রাজ্যে অবাধ ভ্রমণের ছাড়পত্র দেওয়া হয় তাকে।

শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আর একটি উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষায় যে আদর্শ সমাজের কল্পনা হয়ে থাকে তা হচ্ছে ভালবাসার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক বিকাশের একীকরণই এখানে প্রধান লক্ষ্য। নিজের স্বার্থই যেখানে লক্ষ্য সেখানে এই আদর্শ সমাজের উপযুক্ত মানুষ গড়ে উঠা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ পরীক্ষা পাশ যেখানে লক্ষ্য, পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যেখানে সবচেয়ে লোভনীয় সার্থকতা, সেখানে একে অপরকে সাহায্য করা কঠিন। এখানে কৃতিত্বের দৌড়ে সকলেই প্রথম হতে চায়। তাই অন্য সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। তাই অন্যকে সাহায্য করাটাকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তো একে ক্ষতিকর বলে মনে করাও স্বাভাবিক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিন্তু এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। যে এগিয়ে আছে সে অপরকে সাহায্য করবে—এটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের একটা অঙ্গ। যে-হেতু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষককে ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে সাহায্য করতে ও শিক্ষা দিতে হয় সেজন্য সর্ব্বদা

সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া চলে না। এজন্য শিক্ষায় অগ্রসর ছাত্রদের অনগ্রসর ছাত্রকে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার সম্পূর্ণতার এটা হয় একটা পরীক্ষা। যে নিজে কোন কিছু আয়ত্ত করেছে তার পক্ষে অপরকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া কিছু অসম্ভব নয়। পরকে না বুঝাতে পারার কারণ প্রধানতঃ দুইটি, প্রথমতঃ বিষয়বস্তুকে আত্মস্থ করতে না পারা, দ্বিতীয়তঃ ভাষার ওপর অধিকারের অভাব। এ দু'টির যে-কোন একটি না থাকলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয়।

সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রকাশ বলতে আমরা যা বুঝি, তা সাধারণ বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষারই পূর্ণতর রূপ। তবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা দেওয়া হয় কাজকে সার্থক করে তোলার জন্য, কেবল মাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য নয়; চিত্র দিয়েই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার কাজ সুরু হয় এবং চিত্র এই শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। অন্য প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃততর ভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সঙ্গীতও এখানে আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ অঙ্গ। সঙ্গীত কাজকে রসসমৃদ্ধ করে তোলে। আত্মপ্রকাশের সহায়তার জন্য এবং বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রদীপণ অঙ্কনের প্রয়োজনও প্রচুর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই সমস্ত দিকেই যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে এগুলিকে আলাদা আলাদা বিষয় বলে মনে করা হয় না। কাজের কাঠামোর ওপর প্রকাশের এই সকল ভঙ্গী বিভিন্ন রঙের পোঁছ টেনে দিয়ে মূল ছবিটাকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে মাত্র।

হিসাব ঃ

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি কাজের হিসাব রাখার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই হিসাব রাখা শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কোন কাজ করে কাজের হিসাব যিনি দিতে পারেন না, বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টিতে তাঁর শিক্ষা পূর্ণ হয়নি বলে মনে করতে হবে।

এই হিসাব রাখাটা সাধারণ বিদ্যালয়ের গণিতেরই অনুরূপ। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্যও রয়েছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হিসাব করা হয় কাজের প্রয়োজনে। কেবল অঙ্ক শেখানোর জন্যই এখানে অঙ্ক কষান হয় না। সাধারণ বিদ্যালয়ে আমরা গণিত শিখি হিসাবের কতকগুলি প্রণালীকে আয়ত্ত করবার জন্য, কোন প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় হিসাব করার জন্য নয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে গণিতের সমস্যাগুলি তাই কাল্পনিক, বাস্তব নয়।

কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক। সাধারণ বিদ্যালয়ে অঙ্ক শেখাবার জন্য প্রথমেই সংখ্যাগুলির সঙ্গে শিশুর পরিচয় করান হয়, তার পরেই শেখান হয় যোগ-বিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকরণ। মনে করা যাক ঃ

২৭০৮৩
৫৯৭২৮
৩৪৭৬
৫৩৬
———

এই যোগ অঙ্কটি শিশুকে করতে দেওয়া হলো। এখানে সংখ্যাগুলি শিশুর কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। যোগ অঙ্ক করার মধ্যে এখানে কেবল মানসিক কসরৎ করা ছাড়া আর কিছু করণীয় নাই।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হিসাবের মূল অনুপ্রেরণা হচ্ছে কাজের তাগিদ। প্রথমতঃ ধারাবাহিক রূপে অঙ্ক শেখাবার চেষ্টা প্রথমে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে করা হয় না। বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন বয়স্ক মনের পরিণত যুক্তির বিশ্লেষণী শক্তির আবিষ্কার, তেমনি বিভিন্ন প্রকরণের ধারাও যুক্তি-

সম্ভূত। বাস্তব কাজে এরা আলাদা আলাদা হয়ে থাকে না, আর প্রথম শেখাবার বেলাতে এদের আলাদা আলাদা করে শেখাবারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে না।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম হিসাব হয় মৌখিক ভাবে। বিদ্যালয়ে মোট বিদ্যার্থীর মধ্যে কতজন উপস্থিত আর কতজন অনুপস্থিত ও তারা কারা কারা আর কেনই বা আসেনি তার হিসাব নিকাশ প্রত্যহ করা হয়। ফলে কিন্তু বিদ্যার্থী গোণা ও বিয়োগ করা—দুইই একসঙ্গে শিখতে আরম্ভ করে। যারা আসেনি তাদের খোঁজ নিতে হয়। ফলে সংখ্যাটা একটা বিমূর্ত্ত অর্থহীন সংখ্যা মাত্র থাকে না, শিশুর কাছে বিভিন্ন সংখ্যার অর্থ পরিষ্কার হতে থাকে। এর মধ্যে শিশুদের বিভিন্ন কাজের জিনিষপত্র বের করে নিতে ও হিসাব করে ফিরিয়ে দিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংখ্যা-গণনার ভিত্তি দৃঢ় হতে থাকে। তারপর আসে হিসাব করে সূতা গুটানোর পালা। এবার শিশুকে দশ দশতার গুণে এক এক 'কলি' করে সূতা বাঁধতে হয়। এর মধ্য দিয়ে শিশু দশকের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং দশের ভিত্তিতে গুণতে শিখার কাজ এবার স্বরু হয়। প্রথমেই কিন্তু দশক সংখ্যাগুলি শিখে। যেমন আজ পাঁচ কলি সূতা কাটা হয়েছে, পাঁচ কলি মানে পঞ্চাশ, পাঁচ দশে পঞ্চাশ। সঙ্গে সঙ্গে আর এক কলি হতে কত বাকি আছে, তার আর কত হলে নূতন কলি উঠবে—ইত্যাদি হিসাব প্রত্যহই করতে হয়। ফলে দশের চেয়ে কম সংখ্যার যোগ-বিয়োগে শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

মিশ্র ও অমিশ্র অঙ্কও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আলাদা করে রাখা হয় না, অনেক মিশ্র অঙ্কই এখানে প্রথম দিকেই চলে। ঘড়ি দেখতে শেখান হয়। দেরীতে এলে কে কতখানি দেরীতে এলো সেটাও হিসাব করতে হয়। বিদ্যার্থীদের প্রথম থেকেই তূলা পাঁজ প্রভৃতি

শিক্ষা নিতে হয়। এভাবে প্রথম থেকেই সময়, ওজন, দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত অঙ্কগুলি এসে পড়বে। কাজের প্রয়োজনে প্রত্যহই এই সব হিসাব কিছু না কিছু করতে হয়; সুতরাং, অভ্যাসের কমতি পড়ে না এখানে।

এই হিসাব করার মধ্যে শিশুর লাভ-ক্ষতি জড়ান থাকে বলে হিসাব জিনিষটা শিশুর কাছে অত্যন্ত আগ্রহময় হয়ে উঠে। এখানে সাধারণ বিদ্যালয়ের অঙ্কের সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অঙ্কের একটা প্রকাণ্ড তফাৎ রয়েছে। কাল থেকে আজ বেশী সুতা কাটা হলো কিনা, আধ ঘণ্টায় আজ ঠিক কত তার সুতা কাটা হলো, তিন মাস বাগানে পরিশ্রম করার পর ঠিক কি পরিমাণ ফসল উঠে এলো, কত পরিমাণ কত নম্বরের সুতোতে নিজের কতখানি কাপড় হবে—এ সব সমস্যা সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখতে পারার আগ্রহের অন্ত নেই শিশুর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের হিসাবের কাজ এই সব আগ্রহকে কেন্দ্র করা হয় বলেই শিশুর কাছে অঙ্ক কষা এখানে ভীতিপ্রদ না হয়ে পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

অনেকে বলবেন যে, এরকম প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে সব অঙ্ক করানো চলে না। এ প্রবন্ধে এই প্রশ্নের বিশদ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে, এমন খুব কম অঙ্কই আছে যা কাজের তাগিদে আসে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সুতা-কাটাকেই কাজ বলে গণ্য করা হয় না, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। শিশুর সমগ্র জীবন ও পরিবেশই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম। এ সম্পর্কিত বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন নিজকে হতে হয় এবং ঐ সকল সমস্যার সমাধান তাকে করতে হয়। এই সকল কাজের মধ্যে গণিতের বিভিন্ন প্রয়োগ সর্ব্বদাই করতে হয়।

তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা।

এখানে বিভিন্ন প্রকরণ আয়ত্ত করার প্রয়োজন যতখানি তার চাইতে ঢের বেশী প্রয়োজন হিসাব করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা। বৈজ্ঞানিক মন গড়ে তোলার জন্য হিসাবের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। প্রায়, বোধ হয়, মোটামুটি প্রভৃতি শব্দ বিজ্ঞানের অভিধানে অচল। অথচ আমাদের চরিত্রে বেহিসেবী মনোবৃত্তির প্রভাবটাই প্রবল। এই মনোবৃত্তিকে দূর করা এবং বিজ্ঞানীসুলভ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হিসাব শেখানোর মূল লক্ষ্য। এই মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার সোপান হচ্ছে হিসাবে আগ্রহ সৃষ্টি করা। সেজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রতি কাজে হিসাবের প্রয়োজন ও তাতে কি লাভ হয়, তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাই মূল লক্ষ্য থাকে।

পৃথিবীতে সকল অঙ্কের মূলে রয়েছে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ—এই চারিটি প্রক্রিয়া। সকল প্রক্রিয়ার অজীর্ণ অভ্যাসের চাইতে এই চারিটি মূল প্রক্রিয়ার উপর প্রকৃত অধিকার জন্মানো প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া বর্ত্তমান অঙ্কের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক একটা সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনাও আমরা শিশু-মনের ভেতর ঢুকিয়ে দেই। দুধে জল মেশানোর অঙ্ক, সুদকষার অঙ্ক, সৈন্যের রসদ ইত্যাদির অঙ্ক এই বিষয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত। শিশুর প্রয়োজনীয় কাজে হিসাবী হ'তে তাকে আমরা শিখাই না অথচ অঙ্কের নামে উপরোক্ত ধারণাগুলির সঙ্গে আমরা তাকে পরিচিত করি। ফলে শিশুর কোন প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না, তার কোন উপকারও হয় না, অথচ পরোক্ষে অপকার হয় অনেকখানি।

এই হিসাব করার মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর সূক্ষ্ম হিসাবী মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা হয়। সাধারণ ভাবে অঙ্কের সঙ্গে তুলনা করলে এখানে বীজগণিত খানিকটা কম শেখানো হলেও গণিত ম্যাট্রিকুলেশন

পরীক্ষার মানের চাইতে কম শিখানো হয় না এবং ইংরেজীতে যাকে বুক কিপিং বলা হয়, তার অনেকখানিই শেখানো হয়ে থাকে। নিজেদের বাজেট তৈরী করতে, লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে, ভাণ্ডারের হিসাব রাখতে, হিসাব পরীক্ষা করতে বিদ্যার্থীরা এখানে অনেকখানি পারে।

বিজ্ঞান ঃ

বুনিয়াদী শিক্ষা বলতেই আমরা বুদ্ধিযুক্ত কাজের শিক্ষা বুঝি। বুদ্ধিযুক্ত কাজের লক্ষণ হচ্ছে প্রগতি। বদ্ধ জল যেমন দূষিত হয়ে উঠতে থাকে, বুদ্ধিহীন কাজও তেমনি ক্রমে ক্রমে প্রগতিহীন হয়ে ওঠে। কাজকে প্রগতিশীল করতে গেলে প্রগতিহীনতার কারণ জানতে হয় এবং সে সব কারণ দূর করে কাজকে সম্পূর্ণতা ও আদর্শের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কাজকে সুনির্দ্দিষ্ট অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবার শক্তি দেয় বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পর্য্যবেক্ষণ। সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকে বিশ্লেষণ করে কার্য্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাণ। এই খানেই সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পার্থক্য। অসম্পূর্ণ, আবছা ধারণার উপর যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি, তাকেই আমরা বলি সাধারণ জ্ঞান বা Common sense of knowledge.

যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় তাকে Inductive method বলে। এই তত্ত্বের আবিষ্কার আমাদের জ্ঞান-জগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে। এই আবিষ্কারের ভিত্তির উপরই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৌধ রচিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে ভাগ করা চলে ঃ—(১) পর্য্যবেক্ষণ, (২) বিশ্লেষণ,

(৩) সংশ্লেষণ, (৪) সিদ্ধান্ত ও (৫) প্রয়োগ। যে-কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করতে গেলে অন্ধভাবে কোন জিনিষ মেনে নেওয়া চলে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যেই বিজ্ঞানের জন্ম। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রথম কথাই হচ্ছে কোন কিছু বিনা যুক্তিতে না মেনে সত্য আবিষ্কারের জন্য নিরলস সাধনা। অথচ আমরা যখন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শেখার জন্য বিজ্ঞানের পুঁথি মুখস্থ করতে বসি তখন জগৎ-সংসার থেকে, পর্য্যবেক্ষণের অনন্ত উপাদান থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে এনে পাঠ্য পুস্তকের কালো কালো অক্ষরগুলির উপর নিবদ্ধ করি। এর ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিবর্ত্তে মানসিক জড়তারই সৃষ্টি হয়। আমরণ স্বীয় প্রচেষ্টায় পর্য্যবেক্ষণ করার পরিবর্ত্তে অন্ধভাবে পাঠ্য পুঁথির ছাপার অক্ষরকেই বেদবাক্য বলে মানতে শিখি।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রতিকাজে শিশুর মধ্যে বিজ্ঞানী সুলভ মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। শিশু যাতে প্রত্যেকটি কাজের সুবিধা ও অসুবিধা, ভুল-ত্রুটি নিজেই নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করতে পারে, সেজন্য তাকে প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয়। শিশু টাকু কাটে। টাকুটা ধাতুর তৈরী, তার দণ্ডটা লোহার, চাক্তিটা পিতলের ; সুতরাং, তাকে ধাতুর সাধারণ সংজ্ঞা এবং লোহা ও পিতলের রঙ্ ও গুণের পরিচয় জানতে হয়। সূতা কাটার উপর বিভিন্ন আবহাওয়ার বিভিন্ন প্রভাব। এই প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সূতা কাটার প্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। এজন্য আবহাওয়া সম্পর্কে শিশুকে জানতে হয়। টাকুর সঙ্গে কুটের ঘর্ষণে টাকুর হুক ক্ষয়ে যায়, ডাঁট গরম হ'য়ে ওঠে। শিশু এসব খুঁটি-নাটি লক্ষ্য করতে শিখে এবং এসবের কারণ জেনে নেয়। কুকড়ি ঢিলা রাখলে টাকুর গতি কমে যায়, সূতা উৎপাদন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কম হয়। শিশুর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং শিশু

প্রগতি ব্যাহত হবার কারণ জেনে তা দূর করে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু সাফাইর কাজ করে, কৃষির কাজ করে। এই প্রত্যেকটা কাজ সুচারুভাবে করার জন্য কাজের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশাস্ত্র জানা প্রয়োজন। কৃষি করতে গিয়ে শিশু বিভিন্ন মাটি, বিভিন্ন আবহাওয়া, বিভিন্ন ঋতু, বিভিন্ন রকমের বীজ ও ফসলের সঙ্গে পরিচিত হয়। সারের উপাদান, প্রয়োজন, বিভিন্ন মাটিতে সারের প্রয়োগ সম্পর্কে সে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে। সাফাইর কাজ করতে করতে সাফাইর বিভিন্ন উৎপাদন এবং দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কে শিশুকে অনেকখানি জানতে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে দুটি মূল কথা হল এই যে: (১) শিশু এখানে পাঠ্য পুঁথিকে মুখস্থ করার উপরই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে না—তাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য মুখস্থ করিয়ে দেওয়াই এখানে লক্ষ্য নয়। শিশু যাতে নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করে, নিজেই পর্য্যবেক্ষণকে বিশ্লেষণ করে, কার্য্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, সে বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য—শিশুর মধ্যে বিজ্ঞানী সুলভ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা, তার দৃষ্টিকে অবারিত ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলা, তার মধ্যে সূক্ষ্ম ও সুনির্দ্দিষ্ট হিসাব করার মনোভাব তৈরী করা, তার ভাষাকে সুস্পষ্ট ও দ্বর্থ্যহীন করে তোলা। এজন্য এখানে অর্জ্জিত জ্ঞানকে বইয়ের ভাষায় প্রকাশ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার উপর জোর না দিয়ে নিজের ভাষায় নিজ নিজ বিবৃতি খাতায় লিখতে শিখান হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শেখার অনুপ্রেরণা জোগায় কাজ। এখানে কেবল জ্ঞান আহরণের জন্যই বিজ্ঞান পড়া হয় না। জ্ঞান আহরণ অবশ্যই হয়, বিদ্যার্থীকে নিজ নিজ সমস্যার সমাধানের জন্য পুঁথির সাহায্য অবশ্যই

গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এখানে মূল লক্ষ্য থাকে কাজের প্রগতি। প্রত্যেক কাজ যথোপযুক্ত না হলে সেই ত্রুটির মূলে কোনো-না-কোন প্রাকৃতিক নিয়ম থাকে। প্রকৃতিতে খেয়াল মত কোন কাজ হয় না। এই সকল নিয়মকে খুঁজে বের করা ও কাজের প্রতিবন্ধক দূর করার মধ্যেই বিজ্ঞানের জ্ঞান নিহিত আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের মধ্য দিয়ে এই সকল নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করার শক্তি অর্জ্জনকেই বিজ্ঞান শিক্ষা বলে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় জীবনের মানকে উন্নত করার কাজে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রয়োগ করার চেষ্টা কি ভাবে করা হয়ে থাকে, তা বুনিয়াদী শিক্ষার পরিবর্ত্তিত কার্য্যসূচীকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে। পাইখানায় যাওয়া, প্রস্রাব করা, মুখ ধোওয়া প্রভৃতি সামান্য কাজ থেকে সুরু করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে যেখানে যতখানি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, তা শিশুকে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আগেই বলেছি যে, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি কাজের হিসাব রাখার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তারই মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করা হয়। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, বিদ্যার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নয় ; স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা নিজ শক্তি বাড়াবার সুযোগ এখানে সর্ব্বত্র রয়েছে।

সামাজিক মূল্য ঃ

প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মূল্য বুঝা বুনিয়াদী শিক্ষার একটি অঙ্গ। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুকে কাজ করতে এবং সেই কাজের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলতে শিখান হয়। শিশুকে সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত শোষণহীন স্বাবলম্বী সমাজের উপযুক্ত নাগরিক রূপে। গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

আমাদের চারিদিকে আজ যে সমাজ রয়েছে তা এই আদর্শে গঠিত সমাজ নয়। এই সমাজে শোষণের মূল জাতির জীবনের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত; এই সমাজে অসহায় পরাবলম্বন সাধারণ ঘটনা, এমনকি শারীরিক শ্রম সম্পর্কে পরাবলম্বন কৌলীন্যের লক্ষণ। সুতরাং, এমন পরিবেশের মধ্যে নূতন আদর্শে কাজ করতে গেলে গভীর নিষ্ঠা এবং যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি কাজের সামাজিক মূল্য, অর্থাৎ (ক) নৈতিক, (খ) অর্থনৈতিক, (গ) রাষ্ট্রনৈতিক ও (ঘ) ইতিহাস-ভৌগোলিক মূল্য না জানলে সে রূপ গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই মিলের যুগেও টাকু অথবা চরকায় সূতা কাটা হ'য়ে থাকে। বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে এ একটা উপহাসের বিষয়। সাধারণ লোকের মনেও এ যুগে চরকার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস সুপ্রচুর। এ যে অযথা পরিশ্রম, কালক্ষয় ও পাগলামি, সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ নেই। বিজ্ঞ লোকের এমনিতর উপহাসে খাদি ছেড়েছেন, এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। বস্তুতঃ হাতে সূতা কাটার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে না বুঝা পর্য্যন্ত এ রকম সংশয় স্বাভাবিক। পরিচ্ছন্ন থাকতে আমরা সকলেই চাই। এ যে ভাল, তাতে কারো সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজের গৃহ ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে আমরা চাই না, এতে আমাদের সম্মানের হানি হয় বলেই আমরা মনে করি। অথচ মেথরের অভাবে—এদের ধর্ম্মঘটের সময় জঞ্জালের নরককুণ্ডে বাস করা সম্মানজনক অথবা নিজ হাতে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা অধিকতর সম্মানের, তা আমরা ভেবে দেখি না। নিজেদের সুবিধার জন্য, সামান্য স্বার্থের লোভে মেথর জাত সৃষ্টি ক'রে তাদের শোষণ করা যে নিজের, কাজের ও সমগ্রভাবে মানুষ জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, সে কথা আমরা বুঝতে পারি না যতক্ষণ

না আমরা কাজটার নৈতিক দিকে দৃষ্টিপাত করি। এমনি ভাবে আমরা আজ বৃহৎ যন্ত্র, শিল্পায়ন প্রভৃতির জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। এই শিল্পায়নের জন্য কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ফলে কি করে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয়, তা না জানালে আমরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় কুটীর-শিল্প কিছুতেই নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে পারি না। মানুষ যখন নিজের হাতে কাজ করা ছেড়েছে, ক্রীতদাস বা যন্ত্রের উপর নির্ভর করেছে তখন তার কি দশা হয়েছে, তার ভুরি ভুরি সাক্ষ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। ভূগোল ও ইতিহাসের এই সাক্ষ্য জানতে না পারলে আমাদের প্রচেষ্টা অন্ধ থেকে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমান ও অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যদি শিক্ষা গ্রহণ না করি, তবে আমাদের কাজ হবে অন্ধের পথ খোঁজার মত। এ জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার এই দিকটার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই দিকটা চলতি বিদ্যালয়ের পৌর-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ভূগোলের শিক্ষার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু প্রভেদ এখানে এত সুস্পষ্ট যে, তা লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে পৌরবিজ্ঞান সাধারণতঃ অতি সামান্যই শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। ইতিহাস-ভূগোলকে এখানে আলাদা আলাদা বিষয়রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস পড়াবার বেলা সন, তারিখ আর রাজা-রাজড়ার নাম-ধাম বংশ-পরিচয়ই হ'য়ে ওঠে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের সামাজিক মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেওয়া হয়। এখানে যে পৌরবিজ্ঞান শেখান হয়, তা ছাত্রদের নিজের সমাজে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন পরিচালনার মধ্য দিয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যার্থীরা এখানে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তারই মধ্য দিয়ে তারা পৌর-

বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। তা ছাড়া স্বাবলম্বী, সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের দৃষ্টিতে যে-কোন কাজের মূল্য কি তা যাচাই করে কাজটি গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করতে শিখে।

ইতিহাস-ভূগোলকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আলাদা আলাদা করে ধরা হয় না। ইতিহাস শেখাবার বেলা সন, তারিখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-রাজড়ার ওপর এখানে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষা বিদ্যার্থীরা গ্রহণ করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন কালের অভিজ্ঞতার শিক্ষা থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যও সেই শিক্ষা অনুসারে কাজের গতিপথ স্থির করার জন্য। জগতে কোন সমস্যাই নূতন নয়। বিভিন্ন কালের পটভূমিকায় বিভিন্ন জাতির সামনে কতকগুলি মূল সমস্যা বিচিত্র বেশে এসে হাজির হয়; যেমন, বস্ত্রের সমস্যা, অন্নের সমস্যা, আবাসের সমস্যা, সুশাসনের সমস্যা। যুগে যুগে এই সব সমস্যা মানুষের সামনে, সভ্যতার বিভিন্ন পর্য্যায়ে, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে এসে হাজির হয়েছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোন চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, কোথাও বা আংশিক সফলতা পাওয়া গেছে, কোথাও পূর্ণতর সমাধান মানুষের ভাগ্যে জুটেছে। জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই সব সমস্যার সমাধান অনুযায়ী। মানুষের সভ্যতার সমস্যা ও সমাধানের প্রচেষ্টা, তার কৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের এই কাহিনীই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। কারণ, এই শিক্ষার ভিত্তিতেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ কাজকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

এই ভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু দানা বাঁধে। বিভিন্ন বিষয়কে এখানে আলাদা ভাবা হয় না

এবং এক বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে আর এক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। কি করে এক একটি কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার বিশদ বিবরণ অন্যত্র দেবার চেষ্টা করব। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, যাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান বলে তাও কি ভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আসে।

শিশুর মানসিক বিকাশ—বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শিক্ষা

এবার আমরা বুনিয়াদী শিক্ষায় কি ভাবে লেখা-পড়া শেখান হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। এ বিষয়ে কোন শেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে গেছি বা এ সম্বন্ধে সকল সমস্যার সদুত্তর আমরা পেয়েছি, সে দাবী আমরা করছি না। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা প্রয়োগের যে ফল পাওয়া গেছে এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি ও ফল পেয়েছি তারই উপর নির্ভর করে আমাদের সিদ্ধান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার স্থান এখনও অজস্র রয়েছে। মাত্র নয় বৎসরের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পরীক্ষার অবসর সামান্যই জুটেছে। তবে এই কয় বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে একটা নতুন পথরেখার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সে পথ যে আমাদের আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যের দিকে স্থির এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এটুকু নিশ্চয় যে, অনেকের অভিজ্ঞতা, অনেকের পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে উপাদান-ঐশ্বর্য্য অনেক বেড়ে যাবে—আজকের এই ক্ষীণ গঙ্গোত্রীধারা বিরাট এবং সার্থক রূপ নেবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড অভিযোগ এই যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথমেই বর্ণপরিচয় করান হয় না। বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে ফিরে গেলে মা-বাপ যখন প্রশ্ন করেন ঃ "আজ কি লেখা-পড়া করে এলি ?' শিশু তখন অম্লান বদনে উত্তর দেয় ঃ "কিছু না।" মা-বাপ জিজ্ঞেস করেন ঃ "তবে সারাদিন করেছিস কি ?" উত্তর আসে, "সাফাই করেছি, সূতা কেটেছি, গান গেয়েছি, ছবি এঁকেছি আর

খেলা করেছি।” এমনি করে যায় একদিন, দু’দিন, আরো দু’চার দিন। তারপর বাপ-মা সিদ্ধান্ত করে বসেন: “ওখানে শেখায় না কিচ্ছু। অন্য ছেলেরা পাঠশালে গিয়ে লেখাপড়া শিখে ফেল্ল, আর আমার ছেলেটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গিয়ে একেবারে মূর্খই থেকে যাবে।” সুতরাং হঠাৎ একদিন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছেড়ে শিশুকে হয় অন্য বিদ্যালয়ের পথে হাঁটতে হয়, নয়তো বাড়ীতে বদ্ধঘরে বসে ‘ব’ এ আকার ‘বা’ ‘ক’ এ য-ফলা ‘ক্য’ বাক্য, ‘ঐ’ আর ‘ক’ এ য-ফলা ‘ক্য’ ঐক্য ইত্যাদি মুখস্থ করতে হয়।

শিশুকে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে কথা আমরা সর্ব্বপ্রথমে ভুলে যাই, তা হচ্ছে শিশুর অস্তিত্ব, তার ব্যক্তিত্ব। শিশুকে আমরা কেবলমাত্র আমাদের সম্পত্তি বলে ভাবি এবং তাকে আমাদের মনের মত করে গড়ে তুলতে চাই। ফলে প্রথম থেকেই ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাললাগা-মন্দলাগা, আগ্রহ-অনাগ্রহকে অস্বীকার করা হয়। ‘অ’ ‘আ’ প্রভৃতি বর্ণ বয়স্কমনের ধ্বনি বিশ্লেষণের ফল। শিশুর মনে ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উচ্চারিত শব্দ-ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে বর্ণ-ধ্বনিকে আয়ত্ত করার কোন তাগিদ থাকে না। শব্দ-ধ্বনির মাধুর্য্য ও ছন্দের উপর শিশুমনের একটা আকর্ষণ প্রথম থেকেই থাকে এবং সেই আকর্ষণের ফলেই এই বয়সে শিশু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ধ্বনিগুলিকে নিয়ে খেলা করতে করতে বর্ণ-গুলিকে একটু একটু করে আবিষ্কার করতে থাকে। অল্প বয়সে জোর করে বর্ণগুলির সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করলে শিশু বর্ণ-গুলিকে চিনবার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা বোধ করে না এবং এর ফলে বর্ণ-পরিচয়ে শিশুর কোন আগ্রহ বা সক্রিয় প্রচেষ্টা না থাকায় শিখতে অযথা বেশী সময় লাগে এবং জোর করে শেখান হয় বলে অনেক সময় নানা কুফলও ফলে থাকে। অনেক সময় এই সব কারণে পড়াশুনার প্রতি শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, স্কুল পালিয়ে সে পড়াশুনা

এড়াবার চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কুসংসর্গে পড়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পড়াশুনা ছাড়ার পর অধিকাংশ লোক উত্তর-জীবনে যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর হ'য়ে যায়, তারও একটা কারণ এইখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। ধরে বেঁধে শেখান শিক্ষা শিশুর মনের মধ্যে ভাল করে দাগ কেটে বসে না ; ফলে সামান্য অভ্যাসেই সেই ক্ষীণরেখা সম্পূর্ণ মুছে যায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আমরা প্রায়ই একটা অভিযোগ অভিভাবকদের কাছ থেকে শুনতে পাই যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আসার মাস খানিকের মধ্যেই অনেক শিশু আগে শেখা 'লেখাপড়া' একেবারে ভুলে গেছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়েও বারে বারে এই কথা মনে হয়েছে যে, সাধারণ শিক্ষায় শিশু যেভাবে লেখাপড়া শেখে, সেটা শেখাই নয়।

বর্ণ-ধ্বনি বা বর্ণের আক্ষরিক রূপকে আয়ত্ত করায় শিশুর কোন প্রয়োজন বা তজ্জনিত আগ্রহ না থাকলেও, শব্দ-ধ্বনি ও তার আক্ষরিক রূপকে আয়ত্ত করার মধ্যে শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহ দুই-ই থাকে। 'অ' 'আ' প্রভৃতি না শিখলে শিশুর কিছুমাত্র আসে যায় না ; কিন্তু 'মা', 'বাবা', 'দুধ', 'ভাত', 'খাব' প্রভৃতি শব্দকে আয়ত্ত করা শিশুর জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। এইজন্য শিশু যে বয়সে বর্ণ নিয়ে সামান্য-মাত্রও মাথা ঘামায় না, সেই বয়সেই সে নিজের একান্ত চেষ্টায় ঐ সব শব্দগুলিকে আয়ত্ত করতে আরম্ভ করে। ভাষা বা আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতার বিকাশ আমাদের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই এই ক্রম অনুসারে ঘটে। শিশু প্রথমে 'ম' আর 'আকার' চিনে তবে 'মা' ডাকতে শিখে না, কিংবা প্রথমেই 'দু', 'ধ', 'খা', 'ব' প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে 'দুধ খাব' বলে চেঁচায় না। প্রয়োজনের তাগিদে এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহের বশে শিশু প্রথমেই আশপাশের কথাবার্ত্তা থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি চিনে নেয় আর তাদের নামগুলি জেনে নেয়। বুনিয়াদী

শিক্ষায় শিশুমনের বিকাশের এই স্বাভাবিক ক্রমের সুযোগ গ্রহণ করা হয়।

শিশুমনের আর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, রূপ ও রেখার বাঁধনে পরিচিত জিনিষগুলিকে বেঁধে রাখার। বলা হয়ে থাকে যে, শৈশব থেকে যৌবনে আসার সময়টুকুর মধ্যে মানবমন প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সভ্যতার বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। মানুষের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, আদ্যি কাল থেকেই রূপরেখার প্রতি মানবমনের একটা আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের ফলেই গুহাবাসী মানব গুহার ছাদে নানাবিধ জন্তু-জানোয়ারের ছবি এঁকে রেখে মহাকালের মণিকোঠায় তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। লিখিত ভাষার ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেও একই সাক্ষ্য জোটে। ছবি থেকে যে ধীরে ধীরে বর্ণমালার ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ নানা দেশের, নানা ভাষার ইতিবৃত্তে রয়েছে। শিশুর সহজ প্রবৃত্তির মধ্যেও আমরা এই সত্যের প্রমাণ পেয়ে থাকি। শিশু ছবি দেখতে ভালবাসে, হাতে একটু করে চক পেলে নিজের মনের খুশীতে সর্ব্ববিধ বস্তুর খুশীমত রূপ দিতে বসে যায়, যে বাপ-মা ভাই-বোনকে সদাসর্ব্বদা চারপাশে দেখে তাদের প্রতিকৃতি পেলে তন্ময় হ'য়ে বসে দেখে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুমনের এই সহজ প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে লেখাপড়া শেখানর ব্যবস্থা করা হয় দুই ভাবে। প্রথমতঃ শিশুকে নিজের খুশীমত আঁকতে উৎসাহিত করা হয়। শিশুর চার পাশে বিবিধ দ্রব্যের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শিশুও তার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য-গুলি আঁকার কাজে সানন্দে লেগে যায়। এই শিক্ষার মারফৎ বিভিন্ন মাংসপেশীর উপর শিশুর কর্তৃত্ব জন্মাতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও খুঁটিনাটি দেখতে শেখে—রঙের বৈচিত্র্য, টানের কারিকুরি শিশুর চোখে

ধরা দিতে থাকে মাংসপেশীগুলির উপর শিশুর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের কাজে ; অবশ্য তার শিল্প-কাজও তাকে অনেকখানি সাহায্য করে। এর পর ধীরে ধীরে ছবির সঙ্গে ছবির নামও যুক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর শিশুকে ছবি ছাড়া শুধু নামটাকেই চিনতে ও আঁকতে শেখান হয়।

অন্যদিকে শিশুর নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ এবং নিত্যকরণীয় প্রক্রিয়াগুলির নামের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটান হয় এবং এইভাবে শিশুর শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়। অতি অল্প বয়সে শিশু যেভাবে এবং যে কারণে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই 'জল', 'গরম', 'ঠাণ্ডা', 'দুধ', 'খাব' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়, সেই ভাবেই তাকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথমে 'ঝাড়ু', 'কোদাল', 'তূলা', 'সূতা', 'সূতাকাটা', 'তূলা পেঁজা', 'তূলা ধোনা' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত করান হয়। এগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ এবং নিত্যকরণীয় কাজ। ঠিক যেমন শিশুর পক্ষে 'দুধ', 'খাব' ইত্যাদি শব্দ না শিখলেই নয়, এ ছাড়া তার জীবন পঙ্গু হ'য়ে যায়, তেমনি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর পক্ষে এ সকল শব্দ শেখা অপরিহার্য্য, নইলে বিদ্যালয়ে তার কাজের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, শিশু সাগ্রহে শব্দ লিখে আয়ত্ত করতে শিখে এবং বার বার প্রয়োগ করা হয় বলে উচ্চারণ-বিশুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়াও সহজ হ'য়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে শিশু আসার পর শিক্ষকের সর্ব্বপ্রথম কাজ হচ্ছে শিশুর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়া। এই পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথম থেকেই শিশুর উচ্চারণ-বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষকের কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, উঠাবসা, চালচলন, কথা বলার ভঙ্গীর প্রতিও শিক্ষককে এই সময় থেকেই দৃষ্টি দিতে হয়।

তারপর প্রতিদিন বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ে আসামাত্র শিক্ষক কতজন বিদ্যালয়ে এলো তা গুণে নেন এবং এই গণনা-কার্য্যে সাহায্য করতে

বিদ্যার্থীদের উৎসাহিত করেন। এখান থেকেই শিশুর সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়। কতজনের মধ্যে কতজন আসেনি তা গুণে নেওয়া হয়; যারা আসেনি, তাদের নাম বের করা হয়। সমস্তটা কাজেই বিদ্যার্থীরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। এবারে শিক্ষক কৃষ্ণ-পটে লেখেন: "বুধবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৫৫ সন। আজ ১৮জন বিদ্যালয়ে এসেছে। ৩ জন—রাম, করিম ও মায়া—আসেনি।" তার-পর তিনি নিজের খাতায় হাজিরার হিসাব টুকে নেন এবং কেন টুকে নিচ্ছেন তা বিদ্যার্থীদের বুঝিয়ে দেন। ফলে বিদ্যার্থীরা লেখার তাৎপর্য্য বুঝতে পারে এবং এরই মধ্য দিয়ে লিখতে শেখার আগ্রহ তাদের জন্মাতে থাকে। বিকাল বেলা আবার যখন বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে তখন আবার গুণ্‌তি করা হয় এবং সকাল বেলাকার উপস্থিতির সঙ্গে বিকাল বেলাকার উপস্থিতির হিসাব মিলিয়ে দেখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সকাল বেলা যারা উপস্থিত ছিল এবং বিকালে আসেনি বা বিকাল বেলা যারা নূতন এলো তাদের নাম খুঁজে বের করা হয় এবং কৃষ্ণপটে লেখা হয়। বিদ্যার্থীরা এবার লেখার সার্থকতা বুঝতে পারে, একান্ত প্রয়োজনীয় কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শব্দ ও সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে আরম্ভ হয়।

ঠিক এই ভাবেই শিক্ষক প্রতিদিন কাজের সরঞ্জাম বের করে দেবার সময় কৃষ্ণপটে হিসাবটি লিখে রেখে জিনিষগুলি সকলের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য এক এক জনের জিম্মা করে দেন। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রতিদিনই অন্ততঃ এই কয়েকটি কাজ করণীয় থাকে:—(১) সাফাই, (২) সূতা কাটা, (৩) বাগানের কাজ। সাফাইর কাজ আরম্ভ করার আগে শিক্ষক কৃষ্ণপটে লিখতে পারেন: (পরপৃষ্ঠায় ছবি দ্রষ্টব্য)

এই ভাবে সাফাইর প্রত্যেকটি সরঞ্জামের ছবির পাশে তাদের নাম

লিখে দেওয়া যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন্ জিনিষ কতগুলি বের করে দেওয়া হল তার সংখ্যা পাশে লিখে দেওয়া চলে। এইবার যার

উপর ভাগ করে দেবার পালা এবং সাফাইর কাজ সম্পর্কে দায়িত্ব যার উপর দেওয়া হয়েছে, তাকে ডেকে কোন্ কোন্ জিনিষ এবং কতগুলি আছে, তা কৃষ্ণপটে পড়তে দেওয়া হল ; তারপর তাকে সেই সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত জিনিষগুলি গুণে সমঝে নিতে দেওয়া হল। কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার জিনিষগুলি গুণে কৃষ্ণপটে লেখা বস্তু ও সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে ফেরত নেওয়া হল। বলা বাহুল্য, ভারপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীটির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার্থীর পড়ার কাজ আপনা আপনি হ'য়ে যায়, কখনও কখনও তারা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

এমনি ভাবে স্থতা কাটার আগেও বিভিন্ন জিনিষের ছবি, তাদের নাম ও সংখ্যা কৃষ্ণপটে এঁকে দেওয়া চলে। যেমন ঃ
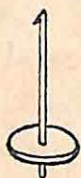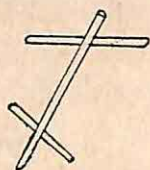
স্থতা কাটার ব্যাপারে একই সংখ্যা—এক্ষেত্রে ১৮—বার বারই লিখতে হবে। প্রয়োজনের অঙ্গ হওয়ায় এই পুনরাবৃত্তি শিশুমনকে

পীড়া দেবে না ; অথচ একই সংখ্যার সঙ্গে বার বার যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় শিশু সহজেই সংখ্যাগুলিকে চিনে নেবার সুযোগ পাবে। সূতা কাটার ব্যাপারে ভাগ যে করে দেবে, তার উপর আরও অনেকটা দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক আসন, টাকু, কুট, নাটাই, টাকুর চোঙ-এ বিভিন্ন বিদ্যার্থীর নাম লেখা থাকে এবং সেই নাম অনুসারে ভাগ করে দিতে বলা হয়। একজনের জিনিষ আর একজনে ব্যবহার করলে কে কতখানি সূতা কাটল তাও হিসাব করে বের করা যায় না আর কার সূতা কেমন হচ্ছে—কোন প্রগতি হচ্ছে কিনা তাও বুঝা যায় না। কথাটা শিশুদের একটু বুঝিয়ে দিলেই তারা জিনিষটা সহজেই বুঝে নিতে পারে এবং নাম অনুসারে জিনিষ ভাগ করে নেবার পেছনে কি সুবিধা আছে, সেটা বুঝে নেয়। এতে শিশুর সম্পত্তি-বোধকেও অযথা উৎসাহ দেওয়া হয় না আবার নিজের জিনিষ নিজে ঠিক ভাবে রাখার ও ব্যবহার করবার এবং নিজের কাজকে উন্নত করার উদ্দীপনাও তারা খুঁজে পায়। শিক্ষকের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃসিদ্ধ। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক শিশুর প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয়, প্রত্যেকের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা এবং সেগুলির সংশোধন করা সহজ হয়, কোন জিনিষ নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার দায়িত্ব একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর দেওয়া চলে এবং লেখাপড়ার দিক থেকে এই ব্যবস্থার ফলে অন্ততঃ প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে নামের আক্ষরিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। কুটে অবশ্য বিদ্যালয়ের নাম, গ্রাম, থানা ও জেলার নাম লিখে দেওয়া চলে এবং তাতে বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে এই সকল নামের সঙ্গেও পরিচিত হ'তে থাকে।

এই লেখার কাজ এবং লিখিত বিভিন্ন নামের সঙ্গে পরিচয় যে প্রথম থেকেই যন্ত্রের মত সুরু করতে হবে, তার কোন অর্থ নাই। শিক্ষকের কাজ এই পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুর মনে চিন্তার

সৃষ্টি করা ও তারপর এই পদ্ধতি অবলম্বনে শিশুর স্বীকৃতি আদায় করা। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে চিন্তায় স্বাবলম্বী করে তোলা, সে যাতে নিজের সমস্যার সমাধান নিজে করার শক্তি অর্জ্জন করতে পারে, নিজের ভাবনা নিজে স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখে, তেমনভাবে শিশুকে গড়ে তোলা। সুতরাং শিশু যাতে প্রথম থেকেই অন্ধভাবে শিক্ষকের অনুসরণ করে তেমন কিছু করা শিক্ষকের উচিত হবে না। তিনি শিশুর সামনে সমস্যাকে তুলে ধরবেন এবং এর সমাধান সম্পর্কে আলোচনায় নিজের যুক্তি রাখবেন ও অন্যের যুক্তি আহ্বান করবেন। সুতরাং টাকুতে নাম না লিখে, ঝাড়ু ইত্যাদির সংখ্যা গণনা না করে বা কোন হিসাব না রেখে প্রথম ২।১ সপ্তাহ কাজ করা যেতে পারে এবং তারপর তাতে কি অসুবিধা বা ক্ষতি হল, তা শিশুকে দেখিয়ে দিয়ে অন্যরূপ কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

কিছুদিন ছবি ও শব্দ পাশাপাশি রেখে পড়ানর অভ্যাস করার পর ছবিকে বাদ দেবার পালা আসবে। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পা দিতে কতদিন লাগবে, তা নির্ভর করবে স্থান-কাল-পাত্রের উপর। সকল শব্দ এক সঙ্গে আয়ত্ত হবে না। এজন্য শিক্ষক শক্ত কাগজে ছবি ও ছবির নাম পাশাপাশি রেখে ছোট ছোট করে কেটে নিতে পারেন। প্রয়োজন পড়লে এ-রকম কাগজের টুকরায় লেখা দেখিয়ে শিশুকে সাহায্য করা চলতে পারে। আলাদা আলাদা বাক্সে বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয়—যথা 'সাফাই সরঞ্জাম', 'সুতাকাটার সরঞ্জাম', 'বাগানের কাজের সরঞ্জাম'—বিভিন্ন বস্তুর নাম লেখা কাগজের টুকরাগুলি রাখা যায়। শিশুরা এগুলি নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে—ঠিক যেভাবে word-making খেলে। এর মধ্য দিয়েও তারা বিভিন্ন দ্রব্য ও প্রক্রিয়ার আক্ষরিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে

বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরী করার বদলে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরীর কাজ চলবে। অবশ্য শিক্ষার এই অংশটুকুকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা বলা চলবে না; নিছক খেলাই বলতে হবে; তবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও ত' খেলাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে প্রথম দিকে। সুতরাং, এই খেলা শিশুর প্রথম শিক্ষার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর হবে বলে মনে হয়। শিক্ষক এভাবে শিশুর খেলার জন্য কি কি উপাদান তৈরী করবেন, সে সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষকের বিবেচনার উপরই নির্ভর করতে হয়; কারণ, এখনও পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে সঠিক কোন উপাদান তৈরী করা হয় নি। আমার মনে হয়, উপযুক্ত শিক্ষক হলে শিক্ষকের এই স্বাধীনতা সুফলই প্রসব করবে। তবে আমাদের ধারণা এই যে, শিক্ষকের রচিত এই উপাদান শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু ও ক্রীড়া সম্পর্কে হওয়া উচিত। শিশুর প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত উপাদানও অবশ্যই তৈরী করতে হবে। তবে নিছক ভিত্তিহীন আজগুবী গল্পের উপাদান তৈরী করার পক্ষপাতী আমরা নই। এ কথা ঠিক যে, কল্পনার খোরাক জুগিয়ে শিশুর আগ্রহ সহজেই সৃষ্টি করা যায় এবং তার ফলে শিশু লিখিত উপাদানকে আয়ত্ত করে গল্পকে জেনে নিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয় এমন কল্পনার মধ্য দিয়েও শিশুর আগ্রহ অনুরূপভাবেই সৃষ্টি করা যায় এবং তাতে শিশুর মানসিক গঠন সুস্থতর হয়।

কাজের সময় ছাড়াও শিশু যাতে যখনই দেয়ালের দিকে চাইবে তখনই কিছু পড়ার উপাদান পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে শিশু সহজেই এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শব্দের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে উঠবে। শক্ত কাগজের ওপর তূলা, সূতা, পাঁজ, কাপড় ইত্যাদি এঁটে পাশে বিভিন্ন শব্দগুলি লিখে দেওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন জিনিষ রাখার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করে সে সব জায়গায় জিনিষগুলির নাম লিখে দেওয়া যেতে পারে ; যেমন—আসনের জায়গায় 'আসন' ঝাড়ুর জায়গায় 'ঝাড়ু' কোদালের জায়গায় 'কোদাল' ইত্যাদি। ব্যবহার শেষ হয়ে গেলেই জিনিষপত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এনে গুছিয়ে রাখতে হবে। তা'ছাড়া বিভিন্ন সরঞ্জামের একটা ছোট প্রদর্শনী প্রথমাবধিই করা চলতে পারে এবং তাতেও বিভিন্ন দ্রব্যের পরিচয় লিখে দেওয়া যায়।

প্রথমাবধি শিশুর পড়ার উপাদান অজস্র বাড়িয়ে যাওয়া চলে। তবে একটা দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার যে, শিশু যেন পড়ার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্ষুধার তৃপ্তির খোরাক পায়। যা সে বোঝে না, যাতে তার দরকার নেই, যে জিনিষ পড়বার প্রয়োজন সে বোধ করে না, তা জোর করে যেন তার ঘাড়ে চাপান না হয়। বিদ্যালয়ে অনেক সময় অনেক নীতিবাক্য, মনীষীদের অনেক ভাল ভাল কথা লিখে রাখা হয়। সে সব কথা বয়স্ক মনের কাছে প্রয়োজনীয় হতে পারে, তাদের কাছে তৃপ্তিকর ও সহজ-বোধ্য হ'তে পারে, কিন্তু শিশুদের কাছে ওই সব বাক্যের মূল্য অতি সামান্য।

কি রকম আলোচনার পর কি রকম পড়ার উপাদান দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা চলে, তার দু' একটা নমুনা নীচে দেওয়া হল ঃ

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষক কার্য্যসূচী রচনা করে থাকেন, যাতে শিশুরা বুঝতে পারে কাজটা তাদেরই এবং কাজ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার অধিকার তাদেরও আছে। এতে শিশু নিজেদের করণীয় ও প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পায় এবং কিভাবে সেই সব কাজের সুব্যবস্থা করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পাবে। তারপর শিক্ষক এই ভাবে আলোচ্য বিষয়টিকে লিপিবদ্ধ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে

পারেন ঃ "কার উপর কোন কাজের ভার পড়ল, কবে কোন্ কাজ কতক্ষণ হবে, তা যদি ভুলে যাই তবে কি হবে! আচ্ছা, আমরা আমাদের আজকের কথাগুলি লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখিনা কেন? ভুলেও যদি যাই তবে ত' দেয়ালের লেখাটা দেখলেই আবার তা' মনে করে নিতে পারব।"

এরকম ভাবে লিখে রাখার প্রস্তাবে বিদ্যার্থীদের মত পেতে বিন্দুমাত্র দেরী হবে না। উপযুক্ত শিক্ষক লেখা এবং সাজানর ব্যাপারের মধ্য দিয়ে শিশুদের সামনে প্রকৃত সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন রাখবার সুযোগ পাবেন।

একখানা কাগজে লেখা যেতে পারে ঃ

এই সপ্তাহের কাজের ভার

(১) পানীয় জল তোলা ও কলসী পরিষ্কার করে রাখা—অসীম, মায়া।

(২) ঘর পরিষ্কার করা—সুধীর, করিম, গোবর্দ্ধন।

(৩) বারান্দা ও উঠান পরিষ্কার করা—সুবোধ, সুষমা, পারুল, লক্ষ্মণ ও ফতেমা।

(৪) আসন ও প্রার্থনার জায়গা সাজান—সহীদ, আজাদ, বেলা।

(৫) সূতাকাটার জিনিষপত্র ভাগ করে দেওয়া ও কাজের পরে ফিরিয়ে নেওয়া—প্রতুল, অসীম, সোফিয়া।

(৬) বাগানের কাজের জিনিষপত্র ভাগ করে দেওয়া ও কাজের শেষে ফিরিয়ে নেওয়া—অক্ষয়, শোভা, যতীন, সাহাবুদ্দীন।

(৭) অতিথিদের অভ্যর্থনা করা ও শ্রেণীর দায়িত্ব—অমল।

আর একখানা কাগজে ঃ

(১) আমরা প্রত্যেক দিন ৪০ মিনিট সাফাইর কাজ করব।

(২) আমরা প্রত্যেকদিন ৮ আনা তূলা পিঁজব।
(৩) আমরা প্রত্যেক দিন ৪ কলি সূতা কাটব।
(৪) আমরা প্রত্যেক শনিবারে পতাকা অভিবাদন করব।
(৫) আমরা প্রত্যেক রবিবার ও বুধবারে শ্রেণীঘর লিখব।
(৬) আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের শ্রেণীঘর, বারান্দা ও উঠান ঝাড়ু দেব।
(৭) আমরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদের সারা সপ্তাহের কাজের হিসাব করব।
(৮) প্রত্যেক দিন কাজ সুরু হওয়ার আগে প্রার্থনা হবে।
(৯) প্রার্থনার গান দেয়ালে লিখে দেওয়া হবে।
প্রত্যেক সোমবারে তূলা দেওয়া হবে।
(১০) প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবারে গ্রামে বেড়াতে যাওয়া হবে।
(১১) প্রত্যেক শুক্রবারে নিজের নিজের কাপড়-চোপড় ও বাড়ী সাফ করতে হবে।

এভাবে প্রয়োজনের খাতিরে লিখিত উপাদানের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো যেতে পারে। লেখাপড়া শেখান আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকবে এবং এজন্য শব্দ নির্ব্বাচনের সময় আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব যেন শিশু তার শব্দ-ভাণ্ডার বাড়াবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হবে যেন কেবলমাত্র পড়ান শেখাবার জন্যই আমরা কতকগুলি লেখা ব্যবহার না করি। প্রত্যেকটি লিখিত উপাদান শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় হওয়া প্রয়োজন এবং শিশুর কাছে ঐ প্রয়োজনের তাগিদ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। শব্দ নির্ব্বাচনের সময় দেখা দরকার যে, একই শব্দ যেন শিশু প্রথমে বারবার দেখবার সুযোগ পায়। এর ফলে শিশু নিজের দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে সাদৃশ্যগুলিকে বের করার

সুযোগ পাবে এবং শিক্ষকের পক্ষেও বর্ণবিশ্লেষণের সুযোগ সহজে জুটবে।

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের ভাগ করার প্রয়োজন প্রথমে হবে না। যুক্ত অক্ষরের সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচয় করান চলবে; কারণ, শিশু প্রথমে সমগ্র শব্দটিকেই ছবি হিসাবে দেখবে এবং সমগ্র শব্দটিকেই একটা ছবি হিসাবে চিনতে শিখবে। একটা ছবি দেখার সময়ও যেমন প্রথম দৃষ্টিতে সব খুঁটিনাটি ধরা পড়ে না, পরে দেখতে দেখতে এবং সবচেয়ে বেশী সেই ছবিকে নিজের হাতে আঁকতে গিয়ে খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তেমনি শিশুর বেলাতেও প্রথমে শব্দের ছবিটির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ঘটবে এবং এর পর বার বার দেখতে দেখতে এবং বিশেষভাবে লিখতে গিয়ে সে পরিচয় সম্পূর্ণ হবে।

শিক্ষককে অবশ্য প্রথম থেকেই যেখানেই লিখে রাখার প্রয়োজন সেখানেই কৃষ্ণপটেই হোক অথবা নিজের খাতাতেই হোক, লিখে যেতে হবে এবং সেদিকে শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হবে। কিন্তু শিক্ষক প্রথমে শিশুকে জোর করে পড়তে, লিখতে বা কোন জিনিষ মুখস্থ ক'রে রাখতে দেবেন না। শিক্ষকের প্রথম কাজ শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করা, শিশুকে বাধ্য করা নয়।

একই অক্ষরযুক্ত বিভিন্ন শব্দ যখন শিশু আয়ত্ত করে ফেলবে তখন আসবে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে একই অক্ষরের তুলনা ও বিশ্লেষণের পালা।

টাকু

টাকুর চোঙ

কুট

নাটাই

প্রত্যেকটি শব্দেই 'ট' অক্ষরটি আছে। বিভিন্ন শব্দগুলি শিশুর আয়ত্ত হ'য়ে গেলে বিভিন্ন শব্দের 'ট'-এর অবস্থানের প্রতি ও এই

অক্ষরটির ধ্বনির প্রতি আমরা শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। অবশ্য আপনা থেকেই শিশুর দৃষ্টি এই সব সাদৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে বিভিন্ন জনের কম-বেশী সময় অবশ্যই লাগে। এইখানেই উপযুক্ত সময়ে শিক্ষকের সাহায্য কার্য্যকরী হয়। শিশুর দৃষ্টি যখন এই দিকে আকৃষ্ট হ'তে সুরু করে, সেই সময়ে সাহায্য পেলেই শিশু সবচেয়ে কম সময়ে ও ভালভাবে শব্দকে বিশ্লেষণ করে বর্ণগুলিকে আয়ত্ত করতে পারে। দেখা যায়, এক এক সময়ে শিশু সুর করে একই রকমের কতকগুলি শব্দ পর পর আবৃত্তি করে, যথা—খেয়েছি, গিয়েছি, নিয়েছি ইত্যাদি। অনেক সময় শিশু একটি শব্দকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে, ধ্বনিগুলিকে যেন আলাদা আলাদা করে ধরতে চায়, যেমন মা-গো, বা-বা-গো, ক-র-ব ক-র-ব-ই-তো ইত্যাদি। এ সময় শিশু পূর্ণ শব্দ-ধ্বনিকে মনে মনে ভাঙতে সুরু করেছে। এ সময়ই শিশুকে সাহায্য করার সময়।

অনেকের এভাবে পড়া শেখানোতে আপত্তি আছে। তাঁরা মনে করেন, এতে শিশুর পড়া শিখতে অযথা দেরী হয়। তাঁরা বলেন যে, শব্দের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটি মূল বর্ণ আছে। যদি মূল বর্ণগুলির দিকে শিশুর দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট করা যায়, তবে শিশুকে কষ্ট ক'রে প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা আলাদা রূপকে চিনবার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা মনে করেন যে, এত বিচিত্র শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে শিশুর অসুবিধা হয়; তারা ভয় পেয়ে যায় শব্দের প্রাচুর্য্য দেখে। যদি অন্তর্নিহিত ঐক্যের দিকে প্রথমেই শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যদি তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি অক্ষর চিনে নিলেই সকল শব্দকে চিনবার চাবিকাঠি পাওয়া যাবে, তবে শিশুর পক্ষে শেখাও সহজ হবে, আর ভয়কেও দূর করা যাবে এবং কাজও হবে তাড়াতাড়ি।

আমরা এই মতবাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমাদের ধারণা, এই মতবাদ বয়স্কদের চিন্তাধারাকে শিশুর কাঁধে চাপিয়ে দেয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, বর্ণগুলি বয়স্কমনের ধ্বনি-বিশ্লেষণের ফলে সৃষ্ট। শিশুর কাছে এই বর্ণগুলির আলাদা কোন অস্তিত্বই নাই। আমরা যদি শিশুকালে নিজেদের প্রথম পড়া শেখার কথা মনে করি, তবে দেখতে পাব যে, আমরা যখন 'হাসিখুশী' পড়েছি তখন 'অ এ অজগর ঐ আসছে তেড়ে', 'আ এ আমটি আমি খাব পেড়ে' ইত্যাদি পড়েছি বটে কিন্তু 'অ' 'আ' প্রভৃতি অক্ষরগুলি আমাদের মনে কোন রেখাপাত করেনি। আমরা পরম আগ্রহে যা পড়েছি তা বিভিন্ন বাক্যগুলি 'অজগর ঐ আসছে তেড়ে', 'আমটি আমি খাব পেড়ে' ইত্যাদি। ওইগুলি পড়তে আমাদের আগ্রহের কোন কমতি হয়নি। বস্তুতঃ যা আমাদের আকৃষ্ট করেছিল তা ওই বিবিত্র বাক্যগুলিই। সুতরাং শব্দ-বৈচিত্র্য দেখে শিশু ভয় পায় এ কথাটা ঠিক নয়; তার আকর্ষণ ওই শব্দগুলিরই প্রতি, তাদের বিশ্লেষণের প্রতি নয়। বস্তুতঃ, পথে শিশুকে যখন জোর করে বর্ণ-পরিচয় করান হয়, তখন সে ওই বর্ণগুলি দিয়ে শব্দগুলিকে চিনবার চাবিকাঠি পাবে, একথা মোটেই ভাবে না। ছবি হিসাবেই অক্ষরগুলিকে মুখস্থ করে যায়। সেজন্যই অক্ষর-গুলিকে চেনার পরেও ওই বয়সে অক্ষর জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা শিশুর জন্মায় না, শব্দগুলিকে সে নেহাৎ যন্ত্রবৎই মুখস্থ করে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সময়ের কথা। তাড়াতাড়ি পড়তে শেখা লাভজনক, এটা শিশুর দৃষ্টিতে বিচার্য্য নয়, বয়স্কদের দৃষ্টিতে বিচার্য্য। এটা মোটর, এরোপ্লেন, কলকারখানার যুগ। এ যুগে 'দ্রুত' আর 'প্রচুর' এই আমাদের বীজমন্ত্র হ'য়ে উঠেছে। এই ধাঁধায় পড়েই আমরা হয়ত ভাবি, শিক্ষা-ব্যাপারেও গতিটাই প্রধান হওয়া উচিত। ধরা যাক্, আজ বিজ্ঞান

এমন কিছু আবিষ্কার করল যাতে আজ যার জন্ম হল কালই সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে কৈশোরের সীমায় পা বাড়াবে, পরদিনই সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হবে, তার পরদিনই মৃত্যু। জীবনের গতি এর ফলে দ্রুত হ'য়ে গেল সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে কি আমরা তুষ্ট হব? সর্ব্বক্ষেত্রেই দ্রুততা সাফল্যের একমাত্র লক্ষণ নয়। পড়া শেখার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি শেখাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, ভাল করে শেখাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত; আর শেখটা আনন্দময় হবে এটাও লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমান পড়ান শেখা যে ভাল করে শেখা নয়, তা বয়স্কদের ছোট বেলায় শেখা লেখাপড়া ভুলে যাওয়ার দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য্য থেকেই বুঝা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এবং লেখাপড়া শেখার জন্য শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করাতেই প্রথমে বেশী সময় দেওয়া হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান জন্মিয়ে দেওয়া যায় সত্য; কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গে তাকে যুক্ত না করার ফলে এবং প্রয়োজনের তাগিদ শিশুকে অনুভব করতে না দেওয়ার ফলে এই রকম শিক্ষার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষার শব্দ ও অক্ষর-পরিচয় হয় প্রয়োজনের তাগিদে, ফলে বিদ্যার্থী জীবনে এর প্রয়োগ বুঝতে পারে এবং শিক্ষার চর্চ্চা চালিয়ে যাবার তাগিদ অনুভব করে। ফলে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শেখা বিদ্যা ভুলে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে জ্ঞান কি ক'রে অর্জ্জন করতে হয়, সেই শিক্ষাটাই দেওয়া হয়। কতকগুলি শিক্ষা—তা শব্দ বা অক্ষরই হোক, নীতিবাক্যই হোক্, সমস্যার সমাধানই হোক—কুইনাইনের বড়ির মত গিলিয়ে দেওয়া হয় না। তাতে প্রারম্ভে সময় বেশী লাগে সত্য, কিন্তু এতে শিশুর মানসিক স্বাবলম্বনের পথ পাকা ভাবে তৈরী হয়। ফলে শিশু প্রথমে ধীর গতিতে এগুলেও পরে দ্রুত গতিতে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত শিশুকে ছাড়িয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত হিন্দুস্থানী তালিমী

সঙ্ঘের ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণীতে বিহারের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-
ছাত্রীদের অন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তুলনামূলক
বিচারের ফলাফলের মধ্যে পাওয়া যাবে। * তৃতীয়তঃ, মনোবিদ্যার
তরফ থেকেও আজকাল বলা হ'য়ে থাকে যে, ৬।৭ বছর বয়স হবার
আগে শিশুর দৈহিক গঠন লেখাপড়া শেখার পক্ষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।
ঐ সময় তার ওপর লেখাপড়ার বোঝা অতিরিক্তভাবে চাপিয়ে দিলে
সেই চাপে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে।
বর্ত্তমান কালে দুইটি শিক্ষায় প্রগতিশীল জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে
আমরা এর দৃষ্টান্ত পেতে পারি। ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুরু হয়
৫ বৎসর বয়স থেকে, আর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ৮ বছর বয়সে। কিন্তু
তা বলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে আছে, একথা
মনে করার কোন কারণ নেই ; বরং গত ২৫ বৎসরের ইতিহাস দেখলে
দেখতে পাই, সোভিয়েট শিশুরা ইংলণ্ডের ছেলেমেয়ের চাইতে অনেক
দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল ক'রে বসেছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় পড়তে বা
লিখতে শিখতে প্রথমে সময় বেশী লাগে, একথা অবশ্যই সত্য ; কিন্তু
এই বেশী সময় লাগাকে বুনিয়াদী শিক্ষার একটি ত্রুটি বলে মনে করার
কোন কারণ নেই, বরং এতেই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্নিহিত শক্তির
পরিচয় রয়েছে। এখানে শিশুকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে মানসিক আগ্রহের
জোয়ারের সহায়তায় শিখবার সুযোগ দেওয়া হয় ; এর ফলে বুনিয়াদী
শিক্ষা-পদ্ধতিতে শেখা লেখাপড়া স্থায়ী ও সার্থক হয়।

পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লেখার পাঠও সুরু

---

* বুনিয়াদী শিক্ষার কথা—পৃঃ ২০, Hindusthani Talimi Sangha, Sixth Annual Report pp 52—57.

হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রেও বর্ণ-পরিচয় এবং অক্ষরের উপর হাত বুলান দিয়ে লেখা সুরু হয় না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই শিশুকে খুশীমত ছবি আঁকতে দেওয়া হয়। ছবি আঁকা মানে রেখা, বৃত্ত, বৃত্তাংশ ইত্যাদি নিয়ে কসরৎ করা নয়, নেহাৎই নিজের মনের খুশীতে চারপাশের দেখা জিনিষগুলিকে রূপের বাঁধনে বাঁধবার খেয়াল মাফিক চেষ্টা। শিক্ষকও এই ক্ষেত্রে ছবির ভুল ধরতে বসেন না। শিশু মনের খুশীতে আঁকে, আবার মনের খুশীতেই মিটিয়ে ফেলে। শিক্ষক কেবল সাহায্য করেন ঠিক ভাবে বসতে, ঠিক ভাবে কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল বা চক ধরতে, ছবি আঁকার উপাদানগুলি সম্পর্কে শিশুর ঔৎসুক্য জাগ্রত করতে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মাংস-পেশীর উপর শিশুর কর্ত্তৃত্ব বাড়তে থাকে, রূপ ও আকৃতির বৈশিষ্ট্য শিশুর চোখে ধরা পড়তে আরম্ভ করে। শিশু যাই আঁকুক না কেন, তাতে তার নিজের স্বাক্ষর দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ওই স্বাক্ষর দিয়েই যে তার নিজের অঙ্কিত ছবি কোন্‌টি তা চেনা যাবে, এইটুকু বুঝিয়ে দিলেই শিশুর নিজের ছবিতে নিজের স্বাক্ষরটি এঁকে দেবার আগ্রহের আর অন্ত থাকে না। নিজের নামটি কি ভাবে আঁকতে হয় তা শিশু কুট, টাকু, আসন প্রভৃতি যে-কোন জিনিষে লেখা নিজের নাম দেখেই শিখে নিতে পারে। এই ভাবে নিজের নাম লেখা শেখা থেকেই শিশুর লিখনপর্ব্ব সুরু হয়। এর পরই শিশু সকলের, বিশেষ ভাবে মা-বাবা-ভাই-বোনের নাম লিখবার জন্য চেষ্টা করে। তাতে কোন বাধা অবশ্যই দেওয়া উচিত নয়, আর সক্রিয় ভাবে বিশেষ কোন সাহায্যও শিক্ষকের করার প্রয়োজন নেই। শিশুকে নিজের চেষ্টায় তার ঈপ্সিত নামগুলি লিখতে শেখার সুযোগ দেওয়া হয়।

তারপর শিশু বিদ্যালয়ে আসতে আরম্ভ করার পর ৪ থেকে ৬

মাসের মধ্যেই শিশুকে নিজের হিসাব নিজে রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই কয় মাসের অভিজ্ঞতায় হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা শিশু ভাল করেই বুঝতে পারে এবং সেই জন্য লিখবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ এই সময়ের মধ্যে তার জন্মায়। এই সময়ের মধ্যে শিল্পকাজ করার ফলে হাতের আঙ্গুল ও পেশীর উপর শিশুর কর্তৃত্ব অনেকখানি জন্মায় এবং সেজন্য তার পক্ষে লিখতে শিখা সহজ হয়। তদুপরি এই কয়মাসের মধ্যে হিসাব লিখার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দগুলির সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় হয়।

প্রথমে শিল্পকাজের, বিশেষতঃ সূতাকাটার হিসাব রাখতে শেখানটাই সব চাইতে যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ সূতাকাটার হিসাব রাখার মধ্যে শিশুর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ও আনন্দ অনেকখানি আছে। সে কতখানি সূতা কেটেছে তার নির্ভুল হিসাব সে রাখতে চায়, মোট কতখানি সূতা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে কেটেছে এবং তা দিয়ে কি তৈরী হতে পারে এ জানার মধ্যে তার অনেকখানি আনন্দের খোরাক আছে। দ্বিতীয়তঃ, সূতাকাটার হিসাব রাখাটা খুব সহজ হিসাব থেকে সূক্ষ্ম ও জটিল হিসাবের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। শিশু দাঁত মেজেছে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা চলে, দাঁত না মাজলে কি ক্ষতি হতে পারে তা শিশুকে বলে দেওয়া চলে এবং তাতে ওদের আগ্রহও সৃষ্টি হয় অনেকখানি। কিন্তু "আমি দাঁত মেজেছি" বা "আমি দাঁত মাজি নাই" এ লিখে রাখার সার্থকতা শিশু সহজে বুঝতে পারে না। তা ছাড়া সম্পূর্ণ বাক্যের সবগুলি শব্দ লিখতে পারার আগে এসম্বন্ধে কিছু লিখে রাখাও ঠিক হয় না।

সূতাকাটার হিসাব রাখার মধ্য দিয়ে শিশুর লেখা কি করে এগিয়ে চলে তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

প্রত্যহ সূতাকাটার পর শিশুকে সূতা নাটাইতে গুটাতে বলা

হয়। শিশু দশ দশ তারে এক এক কলি বাঁধে। প্রথম শিশুকে বলা হয়ঃ "আজ কত তার সূতা কেটেছ একটা কাগজে লিখে তোমাদের প্রত্যেকের নাটাইয়ের সূতার মধ্যে গুঁজে রাখ।" কেউ লেখে ৫ কলি, কেউ ৭, কেউ ১ কলি ৬ তার ইত্যাদি যে যত সূতা কেটেছে সেই সংখ্যা। কলি হিসাবে লেখার ফলে ১ থেকে ১০ এর বেশী কোন সংখ্যা লিখতে হয় না। ৪ কলিতে এক পাটি ও ৪ পাটিতে ১ লট্টি বেঁধে নাটাই থেকে সূতা খুলে নেওয়া হয়। সুতরাং, সূতার হিসাব রাখার জন্য ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা এবং তার, কলি ও পাটি—এই কয়টি কথা লিখতে শিখতে হয়। শিক্ষক নাটাইয়ে লেখা সংখ্যা দেখে নিজের হিসাবের খাতায় প্রত্যেক বিদ্যার্থীর কাটা সূতার পরিমাণ লিখে নেন। ফলে সঠিক ভাবে গুণবার এবং সেগুলি সুন্দর ও স্পষ্ট ক'রে লিখবার একটা প্রেরণা ও সুযোগ শিশুরা পায়।

তারপর শিশুদের নিজ নিজ খাতায় নিজ নিজ কাজের হিসাব রাখতে বলা হয়। এবার শিশু নিজের খাতায় অতি পরিচিত বার, তারিখ লিখতে সুরু করে এবং সেদিনের সূতার পরিমাণটা লিখে রাখে। যথা, শিশু একদিন ৬ তার সূতা কাটল। সে তার শিল্প-খাতায় লিখবেঃ

বুধবার, ১লা বৈশাখ, ৬

প্রথম প্রথম লেখা খারাপ হয়, দুর্ব্বোধ্য হয়, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই লেখা সুন্দর হ'তে আরম্ভ করে; অবশ্য যদি কৃষ্ণপটে শিক্ষকের লেখা সুন্দর হয়। দ্রুত লিখার উন্নতিবিধানের পেছনে একটা প্রত্যক্ষ কারণও থাকে;—তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে প্রত্যে-কের সমস্ত সপ্তাহে কাটা সূতার হিসাব করতে হয় এবং সেই হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে সূতা জমা দিতে হয়। যদি লেখা পড়া না যায় বা লেখা ভুল হয়, তবে এই হিসাব করতে বা সূতা মিলিয়ে দিতে যথেষ্ট

বেগ পেতে হয়। এজন্য শিশু সুস্পষ্ট ভাবে নির্ভুল করে লেখার চেষ্টা করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হিসাব রাখাটা পূর্ণতর হতে আরম্ভ করে ঃ

সোমবার, ১৮ বৈশাখ—৬ তার সূতা

বৃহস্পতিবার, ২১শে বৈশাখ—৬ তার সূতা

সোমবার, ২৫শে বৈশাখ—১কলি সূতা কেটেছি।

শুক্রবার, ২৯শে বৈশাখ—আজ ১কলি ৫তার সূতা কেটেছি।

মঙ্গলবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ—আজ আমি ২কলি ১তার সূতা কেটেছি।

এই হিসাব রাখতে গিয়ে একই শব্দ, একই অক্ষর বার বারই ব্যবহার করতে হয়। ফলে অক্ষরগুলির সাথে পরিচয় ঘটান সহজ হয়ে পড়ে এবং চেনা জিনিষকে ভাল করে চিনে নিতে সময় বা শ্রম কোনটাই বেশী লাগে না।

সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করার কাজও পূর্ণতর হ'তে সুরু করে। প্রথমে হয়ত কেবল মাত্র আগের দিনের সূতার পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হয়—আজ গত কালের চাইতে বেশী সূতা কাটা হল, না কম। তারপর প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে কার কম কার বেশী হল এই হিসাবে পা দেওয়া যায়। এর পরের পর্য্যায়ে সমগ্র শ্রেণীর কম-বেশীর হিসাব হয়। তারপর সমগ্র সপ্তাহ, মাস, ষাণ্মাসিক, বাৎসরিক হিসাব রাখার কাজ সুরু হয়। হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার সারমর্ম্মও শিশু লিখে রাখতে শিখে।

একবার লিখা ও পড়া শিখা হ'য়ে গেলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ের শিশুর তুলনায় অনেক বেশী পড়ে ও লিখে, এই আমাদের ধারণা। শিশুকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম ১৷২ বৎসর বই দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু নানাবিধ হিসাব রাখতে দিয়ে এবং নানাবিধ আলোচনার সারমর্ম্ম লিখতে দিয়ে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক

পরিবেশকে পর্য্যবেক্ষণ এবং তাদের সম্পর্কে বিবরণ লিখতে দিয়ে শিশুকে এত বেশী চাপ দেওয়া হয় যে, শিশু নিজের বই নিজেই রচনা করে ফেলে। সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে এই তফাৎ থাকে যে, শিশুর এই পুস্তক তার স্বরচিত পুস্তক, এ তার নিজের আত্ম-প্রকাশের চেষ্টার ফল। ফলে, শিশুর এই লেখাকে সযত্নে রক্ষা করবার প্রতি দৃষ্টিও থাকে বেশী আর এই লিখিত উপাদানকে লিখবার ও পড়বার প্রয়োজনকেও সে ভাল করে বুঝতে পারে। ফলে যে বয়সে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশু পরের বুলি বুঝে না বুঝে মুখস্থ করে এবং কোনমতে শিক্ষকের কাছে তা উদ্গীরণ করেই পরীক্ষার পর সবটুকু ভুলে যায়, সেই বয়সেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু আত্মপ্রকাশের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বই পড়ান হবে না বা বই-এর প্রয়োজন সামান্যই এই ধারণাও ঠিক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় বই পড়ানর সঙ্গে কোন বিরোধ নাই, বিরোধ বই পড়ানর ধরণটার সঙ্গে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বই পড়ানর সঙ্গে বিদ্যার্থীর প্রয়োজন, তার সমস্যা ও সমাধানের কোন যোগ নাই। এখানে শিশু কি পড়বে তার বিচারকর্ত্তা বয়স্করা। কি পড়লে ভাল হবে তা বয়স্করা ঠিক করে রাখেন পাঠ্য পুস্তকরূপে এবং বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার সময় যেন-তেন-প্রকারেণ সেই পুঁথিকেই যথাসম্ভব হজম ক'রতে হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদের নানা প্রকার কাজ করতে হয়। এখানে কাজ বলতে কেবল শিল্পকাজই বুঝায় না,—সাফাইয়ের কাজ, রোগীর সেবার কাজ, রাষ্ট্র, সামাজিক, সাহিত্য বিষয়ক, নানা প্রকার উৎসব রচনাও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল কাজ করতে গেলেই নানা সমস্যার উদ্ভব হয়; নানা গান, কবিতা, গল্প সংগ্রহ করতে হয়; নানা হিসাবের খুঁটিনাটি বুঝে নিতে হয়। শিক্ষক সমস্যা সমাধানের

ইঙ্গিত দেন মাত্র, তারপর বিভিন্ন বিষয়ের যথাযোগ্য পুঁথির খবর দিয়ে দেন। কোন পাঠ্য পুঁথি এখানে থাকে না। শিক্ষকের পরামর্শ অনুসারে বিদ্যার্থী যে কোন পুঁথি ঘেঁটে নিজের সমস্যার সমাধানে লেগে যায়। যে বই তাকে তৃপ্তি দিতে পারে, যে বই পড়ে তার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয়, সেই বই সে খুঁজে বের ক'রে পড়ে। এজন্য সে অনেক বই ঘাঁটে, অনেক খুঁজে দেখে, একখানা নীরস পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই তার পড়াশুনা সীমাবদ্ধ থাকে না। অথচ, এখানে পড়ার গরজ তার নিজের গরজ, সমস্যার সমাধানের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ; সুতরাং, বেশি পড়া তাকে ক্লান্ত করে না। সর্ব্বোপরি তাকে পড়ার বই থেকে লেখকের ভাষায় অধীত বিষয় উদ্গীরণ করতে হয় না। তার প্রকাশ-ক্ষমতা, তার সৃজনী-শক্তির আত্মপ্রকাশের পথ থাকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক না থাকার জন্য। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীকে পড়তে হয় বেশী, অথচ তার আত্মপ্রকাশের, ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গী গড়ে তোলার সুযোগও থাকে বেশী।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখতে মোটামুটি এই বুঝায় :—
"More over, the child, as Dr. Montessori has demonstrated does not make the adult distinction between work ('a necessary art') and play ('pleasure which is an end in itself'). What the child needs is satisfying creative activity and the most intense satisfactions of all come from being allowed to sweep, to wash dishes or clothes, to cook—in a word, to follow the real occupations of real people.' (Marjorie Syker)। বুনিয়াদী শিক্ষায় এই সৃজনী-শক্তিকে উন্নততর করার একটি মাধ্যম হিসাবেই লেখাপড়া শেখান হয়। এজন্য

এই লেখাপড়া হয় আনন্দের বাহন, শিশুরা বুঝতেই পারে না যে তারা চেষ্টা করে লেখাপড়া শিখছে। এজন্যই বাপ-মা উত্তর পান ° "কিচ্ছু লেখাপড়া শিখিনি।"

শেষ